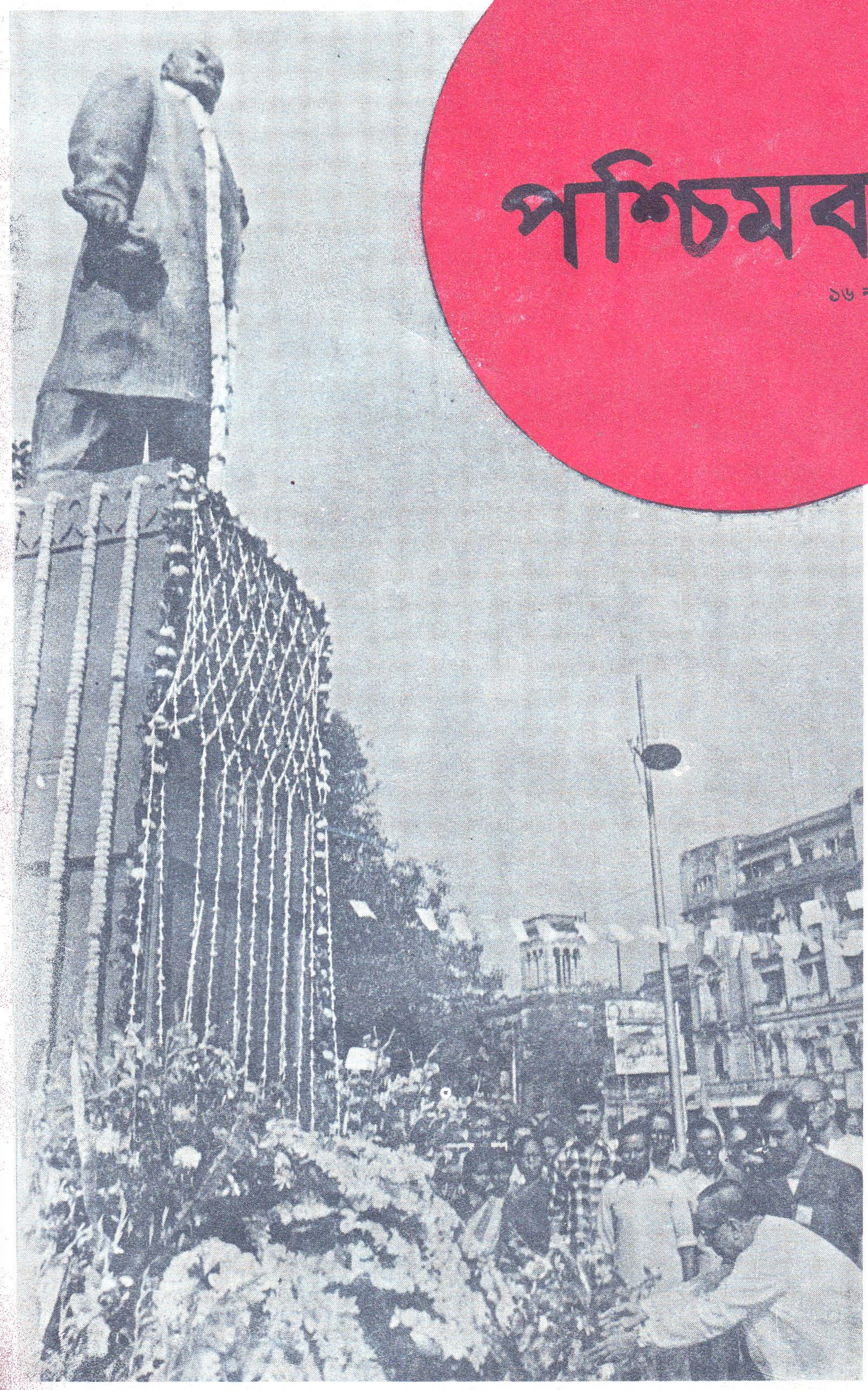
পশ্চিমবঙ্গ

১৬ নভেম্বর ১৯৮৪





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : সুজিত কুণ্ডু

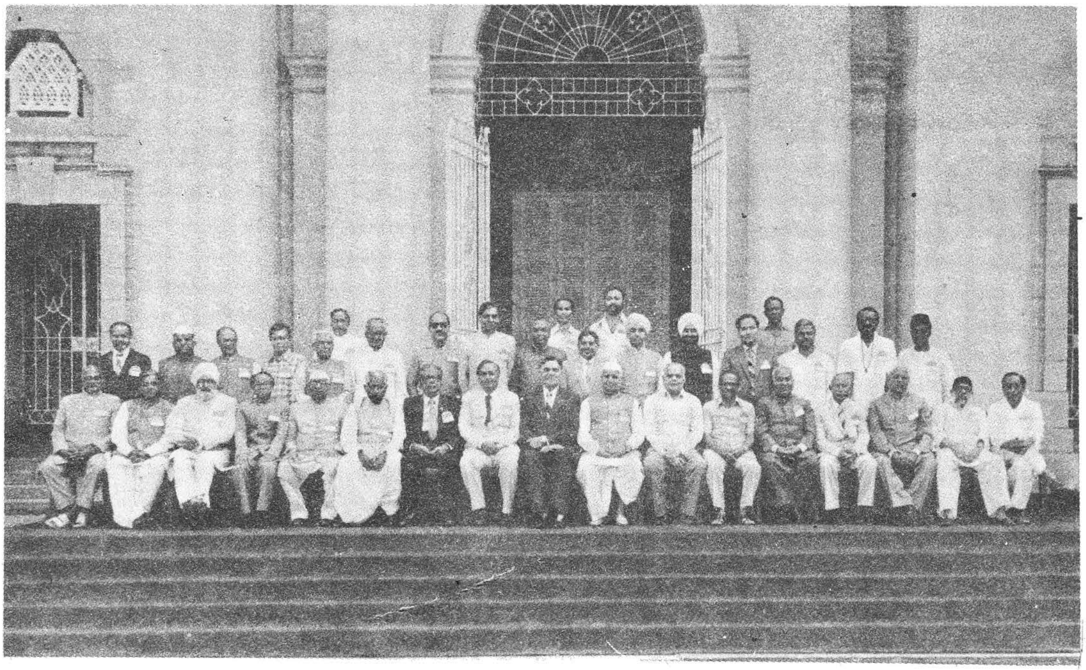
স্ক্যান : ইলা কুণ্ডু

এডিট : সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



ফটোঃ শ্রীঅজিত দাস

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আইনসভা ও সংসদের স্পীকারদের সম্মেলনে যোগদানকারী স্পীকারদের ছবি।

পশ্চিমবঙ্গ

১৬ নভেম্বর ১৯৮৪

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সম্পাদকীয় দপ্তর
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা–৭০০০০১

বিষয় সূচি

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১৯ ১৬ নভেম্বর ১৯৮৪ ৩০ কার্তিক ১৩৯১

ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকারের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

কৃষি ও খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে এবং দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে ভূমি সংস্কার অপরিহার্য

—ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী

পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান এবং তথ্যের অভাবে রাজ্যের ভূমিসংস্কার করতে কিছু অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু কৃষিতে স্বয়ম্ভর হতে হলে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে হলে আমাদের ভূমি সংস্কার ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভূমি রেকর্ডের মাধ্যমে খাজনা আদায়ই মুখ্য বিষয় নয়, ভূমি রেকর্ডের মধ্য দিয়ে কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।

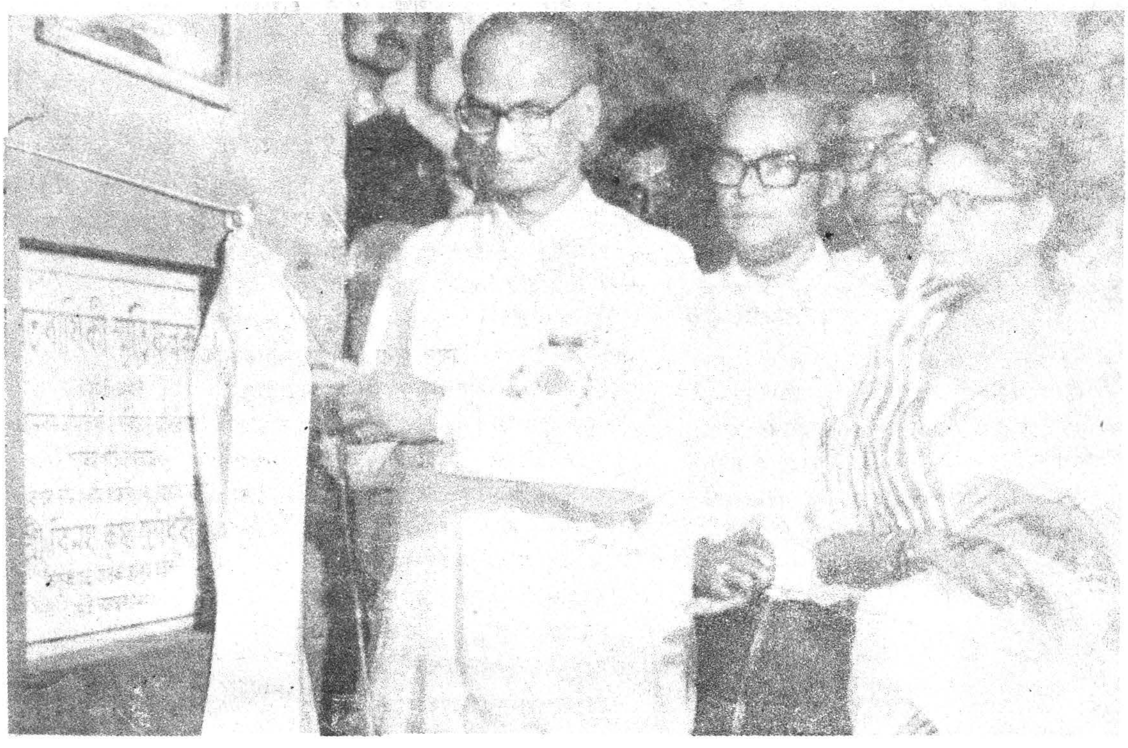
১২ নভেম্বর ১৯৮৪ কলকাতার গোপালনগর রোডে সার্ভে ভবনে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকারের শতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী একথা বলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রী চৌধুরী আরও বলেন, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই একশ বছর পেরিয়ে আসা সত্যিই এক গর্বের বিষয়। কিন্তু এই বিভাগের প্রতিটি কর্মীর মনে রাখতে হবে তাঁরা জাতীয় স্বার্থে কাজ করছেন, জাতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। এই পেশাকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার পন্থা না ভেবে দেশ সেবার মাধ্যম হিসেবেও ভাবতে হবে। অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর না হতে পারলে আমাদের চিরদিনই পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। কৃষিজমির গুণগত মান নির্ধারণ আজ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রাজ্য ভূমিলেখ্য ও জরিপ-এর অধিকর্তা শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংস্থা রাজ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ একর কৃষিজমি নথিভুক্ত করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের কৃষিযোগ্য মোট জমির ৬.৫ শতাংশ। এ ব্যাপারে রাজ্যের ভূমিস্বত্বের নথিপত্র ও জরিপ অধিকারের বড় ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গাদারের নাম পরচার নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে সুসংহত প্রশাসনিক কাঠামো শীঘ্রই প্রবর্তিত হবে।

শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের অঙ্গ হিসেবে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। অন্যান্য অনেক কিছু দ্রষ্টব্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে রেনেলের সার্ভের (১৭৮৩ সাল) কপি যা ব্রিটিশ আমলের জরিপের প্রথম দলিল বলে স্বীকৃত। এছাড়া কলকাতা সম্পর্কে সিম্‌স-এর সার্ভে (১৮৪৯ সাল) এবং স্মার্টস-এর সার্ভে (১৯০৩ সাল) রয়েছে।

ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকারের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে চারটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হল (৪১১-৪২১)।



ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকারের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শতবার্ষিকী স্মৃতিফলক উন্মোচন করছেন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রী বিনয় চৌধুরী

ফটো: শ্রী সুমন্ত পত্রনবীশ

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন

শ্রীনীহার বসু

প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালিত হয়ে থাকে। এ'বছর ৩১ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এ সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য হল, দেশের জনসাধারণকে সমবায়ের আদর্শ, উপকারিতা এবং প্রসার সম্বন্ধে অবহিত করা। সমবায় আন্দোলনের আর্থিক ও সামাজিক ভূমিকা, বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের সু-চিন্তিত পথ নির্দেশ আলোচনা ও সম্মেলনের মাধ্যমে সমাধান করাও এই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংগ।

সারা ভারতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি রয়েছে, যার সভ্য সংখ্যা ১২ কোটির কাছাকাছি। মুখ্যত ঃ কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণ বাবদ অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব সমবায়ের উপর ন্যস্ত। সারা ভারতে ৩২ টি শীর্ষ সমবায় ব্যাংক, ৩৩৭ টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও ৪৫,০০০ প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমবায় সমিতির মারফত বছরে প্রায় দু'হাজার দু'শ কোটি টাকা কৃষকদের স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। দীর্ঘ মেয়াদী কৃষিঋণের জন্য ১৯টি কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও ১৪৮৯ টি প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৮০ লক্ষ কৃষককে প্রয়োজনীয় দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

সমবায় আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে কতটা সাফল্য লাভ করেছে তা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়েএকুশ হাজার বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা হল প্রায় সাড়ে সাত হাজার। একটি রাজ্য সমবায় ব্যাংক, ১৭ টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও সাড়ে সাত হাজার প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি গ্রাম-বাংলার স্বল্প মেয়াদী সমবায় কৃষিঋণ যোগানোর দায়িত্বে রয়েছে। আনুমানিক ৫৪ শতাংশ কৃষি পরিবার সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত। সর্বজনীন সদস্যপদ প্রকল্প অনুযায়ী ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের এবং বর্গাচাষীদের সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ'ছাড়া তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৮২।৮৩ সমবায় বৎসরে ৩১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ও ১৯৮৩।৮৪ সমবায় বৎসরে ৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮২-৮৩ সালের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালে কৃষিঋণ আদায়ের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। কৃষিঋণ আদায়ে সমবায় আন্দোলনে বে-সরকারি নেতৃত্ব, সমবায় সমিতির কর্মীদের দায়িত্ব ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে কৃষিঋণ আদায়ে সভ্যদের উৎসাহিত করেছেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী বছরগুলিতেও সার্থকভাবে কৃষিঋণের ব্যবহার ও সময়মত আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা রয়েছে।

কৃষি ঋণের সহায়ক হিসাবে অধিকতর কৃষি ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন, উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উন্নতমানের গবাদিপশু সৃষ্টি করবে, উন্নতধরনের ফুল-ফলের বীজ তৈরি, মৎস্য প্রকল্প, পান চাষ, পুকুর সংস্কার ও খনন, পাম্পসেট সহ অগভীর নলকূপ, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গোয়ালঘর, গুদামঘর নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও জেলাস্তরে গঠিত ২৪টি প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদী কৃষিঋণ দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংক এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকগুলিকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দিয়ে থাকে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ সহ মোট আদায়ীকৃত ১৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার মধ্যে কেবলমাত্র ১৯৮৩-৮৪ সালেই ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা অদায় হয়েছে অর্থাৎ আদায়ের হার শতকরা ৪৬।

কৃষি ফলনের সুসংযত বিপণন ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ২৯৬টি প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি রয়েছে। এদের মোট সভ্যসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার কৃষিজ দ্রব্য, ৪০ লক্ষ টাকার ফল ও সবজি, একশ কুড়ি লক্ষ টাকার বীজ ও ৩৫ কোটি টাকার সার বিপণন সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় হয়েছে। কৃষিজ দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ টি সমবায় হিমঘরের মধ্যে ২৪ টিতে কাজ আরম্ভ হয়েছে। অনুরূপভাবে সরকারের আর্থিক সহায়তায় এক হাজার একশ একত্রিশটি গ্রামীণ গুদাম, ৭৮টি প্রধান গুদাম ও ৮২টি পাট বাঁধাই কল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায় একটা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হয়েছে ২৮টি পাইকারী ক্রেতা সমবায় ও দুই হাজার তিনশ চুরাশিটি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে বছরে প্রায় একশ পাঁচ কোটি টাকার ভোগ্যপণ্য বিক্রয় হয়ে থাকে।

গৃহনির্মাণ সমস্যার সমাধানকল্পে সমবায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৪১১ টি গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি রয়েছে। শীর্ষ সমবায় আবাসন ফেডারেশনের মারফত রাজ্য সরকারের গ্যারান্টিতে জীবনবীমা কর্পোরেশনের কাছ থেকে ২০ বছরে পরিশোধযোগ্য শর্তে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়। বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও শ্রমজীবীদের নিয়ে আলাদা ধরনের সমবায় সমিতি সংগঠিত হয়েছে।

এখন পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আইন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৮৩ সালে সমবায় আইন সম্পূর্ণ নূতনভাবে গণতন্ত্রমুখী করে সংশোধিত হয়। সম্প্রতি ঐ সংশোধিত আইনের বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। তবে এখন ঐ আইন কার্যকরী করা হয়ে উঠেনি। আইনের নিয়মাবলী প্রস্তুত করার জন্য রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। শীঘ্রই ঐ কমিটির সুপারিশ সমূহ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। নূতন সমবায় আইন পশ্চিমবঙ্গের সমবায় জীবনে একটি নূতন দিগন্তের সৃষ্টি করবে।

পরিশেষে আরও বলি যে, সমবায় আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হলেও এর গতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে। সমবায় আন্দোলন অনেক সমস্যার সম্মুখীন। এখন আশু প্রয়োজন সমবায়ের দুর্বলতাগুলিকে কাটিয়ে তুলে মূল অংশটুকুকে সংগঠিত করা। কায়েমী স্বার্থ যাতে সমবায়কে প্রভাবিত না করতে পারে তার জন্য জনগণকে সচেষ্ট হতে হবে। সমবায় আন্দোলন একটি বেসরকারি আন্দোলন। বেসরকারি নেতৃত্বের প্রতি রাজ্য সরকারের সহযোগিতা থাকবে যদি তার সেই নেতৃত্ব আন্দোলনকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এই সফলতার জন্য সমবায় কর্মীদেরও যথেষ্ট গুরু দায়িত্ব রয়েছে। আসুন আমরা সবাই মিলে সমবায় আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তুলি।

নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী শ্রীনীহার বসুর বেতার ভাষণ

শতাব্দীর কথা

শ্রী কৃষ্ণপদ শাণ্ডিল্য (শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে)

প্রস্তাবনা

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি লেখ্য ও পরিমাপ অধিকারের একশ' বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু শেষের পরেও যেমন কথা থাকে, তেমনি থাকে শুরুর আগেও। সেই কথা সংক্ষেপে বলি। সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল আলোড়নে তখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে গেছে, এসেছে ব্রিটিশ আইন সভার খাস শাসন। ইংল্যান্ডের রানী তখন ভারত সম্রাজ্ঞী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ততদিনে পুরনো প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তার ভিতে প্রথম সরু চিড় দেখা দিয়েছে ১৮৫৯ সালের রেন্ট্ অ্যাক্টে। ইংরেজ ভারতে শুরু করেছে, ভূমি ব্যবস্থায় কোথাও একটা গলদ আছে। প্রথম যে গলদ তার নজরে এসেছে, তা জমিও কৃষি সম্বন্ধে তথ্যের অভাব। এই পরিপ্রেক্ষিতে–১৮৮১ সালে বাংলা সরকার আর ভারত সরকারের মধ্যে পত্রবিনিময় শুরু হল। ১৮৮১ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে প্রদেশ সরকারের অধীনে কৃষি দপ্তর খোলার নির্দেশ দিলেন ভারত সরকার। বহু পত্রালাপের পর ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি প্রদেশ সরকার ভূমি লেখ্য ও কৃষি অধিকার বলে একটি দপ্তর খোলার অনুমোদন চাইলেন। ঐ বছরই ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত সরকার অনুরূপ প্রস্তাব সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে পাঠালেন। পরের বছর ১০ ই এপ্রিল তারিখের পত্রে সেক্রেটারি অব স্টেট কতগুলি প্রশ্ন রাখলেন। তার ধারণা ছিল, অনেক জায়গাতেই ওয়ার্ড এবং সরকারি মহলের জরিপ হয়ে গেছে। সে কাজ কি আবার করতে হবে? তাই যদি না হয় নূতন দপ্তরের অধিকর্তার কী কাজ থাকবে? পরের মে-মাসে দু'বছরের জন্য অধিকর্তার পদের অনুমোদন হ'ল। কাজ শুরু করে এবং তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রতিবেদন দিতে বলা হল। প্রতিবেদনের বিষয় ছিল:–

১) কতগুলি ওয়ার্ড ও খাস মহল কতটা এলাকা জুড়ে ছিল;

২) এর মধ্যে কতগুলি মহলের জরিপ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে এবং কোনটার জরিপ ফের করার দরকারআছে কিনা;

৩) কি পদ্ধতিতে জরিপ, স্বত্বলিপি এবং খাজনার হিসাব করা হবে;

৪)দপ্তরের কর্মী কারা হবেন এবং তাদের পরিচালনাই বা কিভাবে হবে;

৫) খরচ কেমন হবে এবং টাকাই বা কে জোগাবে;

৬) ওয়ার্ড এস্টেট মালিকের হাতে ফিরে গেলে জরিপ ইত্যাদির কাগজপত্র কিভাবে রাখা হবে;·

৭) পর্ষৎ নিজেদের তদারকিতে এ-কাজ করতে পারবেন না কেন।

দেখা যাচ্ছে, সরকারের উদ্দেশ্য তখন ছিল সীমিত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মহলগুলি (ওয়ার্ড এস্টেট বাদে) সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনাই ছিল না। খরচা কমানোর ঝোঁকও লক্ষণীয়। তখনকার যুগে এটাই স্বাভাবিক ছিল।

সূচনার যুগ

১৮৮৪ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে এম কিনুকেন অধিকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। আগে রাজস্ব ঠিক করার কাজে তাঁর প্রমাণিত দক্ষতা ছিল। তাঁর প্রশাসনের ভৌগোলিক আয়তন ছিল ১, ৪৮, ৫৯২ বর্গমাইল। এই এলাকার লোক সংখ্যা চার কোটির উপর। তাঁর কাজ ছিল:

১) কৃষিবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ;

২) কৃষিব্যবস্থার উন্নতি;

৩)দুর্ভিক্ষ ত্রাণ;

১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এল। অধিকর্তার নূতন কাজ হল:–

১) বিহারে বিশেষত মজঃফরপুর জেলায় জরিপ ও স্বত্বলিপি:

২) তৈরি স্বত্বলিপির সংশোধনের জন্য নিয়মকানুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা;

৩) প্রধান ফসলগুলির দাম বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ।

এ-ছাড়া সেক্রেটারি অব স্টেটের ফরমায়েসি আগের অনুচ্ছেদ উল্লিখিত প্রতিবেদনটি তৈরি করাও তাঁর কাজের মধ্যে রইল।

তৎকালীন কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে। মজঃফরপুরের প্রথম পরীক্ষামূলক জরিপ সম্বন্ধে কিনুকেন নির্দেশ দিচ্ছেন, মৌজার সীমানা মাপা হবে গানটার চেইনে। ভিতরের দাগগুলি মাপা হবে বিঘায় এবং বিঘার শতাংশে, আঁকাও হবে সেইভাবে।

জরিপ দপ্তর লিপিবদ্ধ করবেন দাগের আয়তন, সেচব্যবস্থা, আর অবির্তকিত দখলের বিবরণ। স্বত্বের বিবরণ লিখবেন রাজস্ব কর্মচারীরা। জরিপ ও স্বত্বলিপির কাজে খরচ হত একরে ন'আনা।

সংগঠনের কাল

১৮৮৭ সালের গোড়ার দিকে সেক্রেটারি স্টেটস স্থায়ীভাবে দপ্তরটির মঞ্জুরি দিলেন। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাজের পদ্ধতি পরিণতিতে এল। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হল সার্ভে ম্যানুয়াল, ১৮৯৫ সালে সার্ভে অ্যান্ড্ সেটলমেন্ট্ ম্যানুয়াল। এরমধ্যে স্বত্বলিপির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কাজেই স্বত্বলিপিতে জালিয়াতির প্রবণতাও। ১৯০০ সালে বিশেষ কালির ব্যবহার চালু হল, যাতে জালিয়াতি করা কঠিন হয় এবং করলেও চট ক'রে ধরা পড়ে। ১৯০৩ সালে পর্ষৎ জেলা প্রশাসনকে রাজস্ববিষয়ক, ফৌজদারি এবং প্রশাসনিক কাজে স্বত্বলিপি ও মানচিত্র ব্যবহার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দিলেন। ১৯০৪ সালে ফটোজিনকোগ্রাফি বা ভ্যান ডাইক পদ্ধতিতে মানচিত্র ছাপা চালু হল। এখনও এই পদ্ধতিই চলছে। ১৯০৫ সালে কৃষি বিভাগ স্থাপিত হওয়ায় অধিকারের নাম হল ভূমিলেখ্য অধিকার। কিন্তু সেই সঙ্গে জরিপ বিষয়ে দায়িত্ব বাড়ল। কৃষি বিভাগ আলাদা হলেও কৃষি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের কাজ কিন্ত অনেকটাই থেকে গেল। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে অধিকারের এক্তিয়ারের তল্লাটও বারবার ভাঙা গড়া হল। এক্তিয়ারের শেষ বদল হয়েছে ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া ও ইসলামপুরের বঙ্গভুক্তির ফলে।

ক্যাডাস্ট্রাল বা জেলা সেটলমেন্ট

এর মধ্যে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এসে গেছে। এই আইনে বিভিন্ন স্তরের প্রজার অধিকার নির্ধারিত হল। এর আগে খাস মহল, ওয়ার্ডের মহল আর অস্থায়ী ইজারার মহল ছাড়া সরকারের যোগাযোগ ছিল কেবল জমিদারির সাথে, প্রজার সাথে নয়। এবার প্রজার রক্ষক হিসাবে সীমিত হলেও তার একটা ভূমিকা এল। প্রয়োজন হল আরও বিস্তারিত জরিপ এবং স্বত্বলিপি প্রস্তুতির, যাতে প্রত্যেক টুকরো জমিরউপরে জমিদার থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম প্রজা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের স্বত্ব ও দখল জানা যায় এবং প্রত্যেক টুকরো জমি নিখুঁতভাবে মানচিত্রে ওঠে। তার সাথে দরকার সেচের খুঁটিনাটি, গোমহিষের ফর্দ জমির শ্রেণী, ফসলের বিবরণ, গোচর, পথ ইত্যাদি স্বীকৃত অধিকার, এবং আরও হরেকরকম খুঁটিনাটি। কি বিরাট কর্মযজ্ঞে হাত দেওয়া হয়েছিল, ভাবতে অবাক লাগে। এ-জরিপ শুরু হয়

চট্টগ্রামে ১৮৮৮ সালে আর শেষ হয় হাওড়া জেলায় ১৯৩৯ সালে। মাঝখানে দুটি বিশ্বযুদ্ধে কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। এই সেটেলমেনটের ছাপা স্বত্বলিপি এখন জেলা সমাহর্তাদের অফিসে এক বিরাট ও সর্বাংশে সার্থক কর্মযজ্ঞের সাক্ষী হিসাবে রক্ষিত আছে।

এর মধ্যে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিমাপ অধিকার সম্পর্ণভাবেই ভূমিলেখ্য অধিকারের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং মিলিত অধিকার ১৯২৪ সালে ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকার নাম নিয়ে-৩৫ নং গোপালনগর রোডের নতুন বাড়িতে উঠে আসে। এখনও সেই নাম, সেই বাড়ি।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদার অধিগ্রহণ আইন—নতুন স্বত্বলিপি ও জরিপ

স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতার পর সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সূচনা হল। ১৯৫৪ সালে এল জমিদারী গ্রহণ আইন। এর প্রধান উদ্দেশ্য:—

১) মধ্যস্বত্বের বিলোপ; প্রজাদের সরাসরি সরকারের অধীনে আনা;

২) জমির ঊর্ধ্বসীমা স্থির করে বাড়তি জমি সরকারে বর্তানো;

৩) মিল, কারখানা ও চা-বাগানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি সরকারের বর্তানো;

৪) প্রাক্তন মধ্যস্বত্বভোগী ও বাড়তি জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

আইনের এই সমস্ত দিককে রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৫৪ সালে নূতন সেটেলমেনট শুরু হল। বেশীর ভাগ অঞ্চলে এই সেটেলমেন্ট্ ১৯৫৮ সালেই শেষ হয়ে যায়, তবে হাওড়া শহর ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় চলে ষাটের দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত। বিহার থেকে আসা এলাকায় কাজ পরে শুরু হয়। ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের মানচিত্র স্বত্বলিপির পর ভিত্তি করে এই সেটেলমেনট্ করা হয় বলে এক সংশোধনী সেটেলমেন্ট্ও বলে।

জমির ন্যাস

বাড়তি জমি সরকারের বর্তানোর কাজও এই অধিকারের হাতে পড়ে। এর জন্য প্রাক্তন মধ্যস্বত্বাধিকারীদের দেওয়া কয়েক লক্ষ রিটার্ন পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দিতে হয়েছে এবং স্বত্বলিপির আনুষঙ্গিক সংশোধন করতে হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ তালিকার প্রস্তুতি

প্রায় ২৪ লক্ষ মধ্যস্বত্বাধিকারীর ক্ষতিপূরণ তালিকা তৈরী করতে হয়েছে। পুরুলিয়া এবং ইসলামপুর ছাড়া অন্যত্র এ কাজ নামমাত্র বাকি আছে—তাও বিচারাধীন মামলার জন্য। ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রধানত জেলা শাসকদের কাজ, তবে অল্প টাকা ক্ষতিপূরণ বিলি করার ভার পরে অধিকারের উপর আসে। এ-কাজ শেষ করা হয়েছে। বাকি তৈরী তালিকাগুলি জেলাশাসকদের দপ্তরে পাঠানো হয়।

আধা-বিচার বিভাগীয় কাজ

এই আইনের অনেকগুলি আধা বিচারবিভাগীয় কাজ এই অধিকারের উপর অর্পিত। ৫.৫.৫৩ থেকে জমি বর্তানোর তারিখ পর্যন্ত বাড়তি জমি রাখার জন্য বাড়তি ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য অনেক ভুয়ো হস্তান্তর হয়েছে। আইন অনুযায়ী তদন্ত করে এই সব হস্তান্তর নাকচ করার ভার এই অধিকারের পরে ন্যস্ত। এভাবে বহু বাড়তি জমি বর্তানো সম্ভব হয়েছে। এ-ছাড়া নিষ্কর জমির-খাজনা নির্ধারণ ইত্যাদি আরও কয়েকধরনের কাজও এই অধিকারের দ্বারা সাধিত হয়েতে দেবোত্তর ও পীরোত্তরের নামে যে অজস্র জমি লুকানো ছিল তার বেশ কিছু সরকারায়ত্ব হয়েছে।

৬(৩) ধারার তদন্ত

চা-বাগান ও কলকারখানার জমিব্যবহারের বিবরণ ও মানচিত্র প্রস্তুত করে উদ্বৃত্ত জমি বর্তানোর নির্দেশের জন্য সরকারকে পাঠানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী তদন্ত

সরকার এই আইনে কোন্, খনি কতটা জমি কি শর্তে রাখবে, তা নির্ধারণ করবেন। এই বিষয়ে তদন্তের ভারও এই অধিকারের। সরকারকে পরামর্শ দেবারজন্য একটি বোর্ড আছে, যার চেয়ারম্যান ভূমি লেখ্য ও জরিপ অধিকর্তা।

ঊর্ধ্বসীমা ফাঁকি বিষয়ে তদন্ত

১৯৬৭ সালে একটি বড় কাজ আমাদের হাতে আসে। আইনের নানা ফাঁকের সুযোগ নিয়ে অনেকেই লক্ষ লক্ষ একর সরকারের বর্তানোর যোগ্য জমি নিজেদের ভোগ দখলে রেখেছিলেন। এই জমি ধরার কাজ এই অধিকারের উপর বর্তায়। কত কৌশলে এই জমি রাখা হয়েছিল, এবং কতরকম পাল্টা কৌশলে সত্য উদ্ঘাটন হয়েছিল, সে বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ হতে পারে। এইটুকুই এখানে বলার অবকাশ আছে, যে এই সব প্রচেষ্টার ফলেই ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বর্তানো জমি এই ছোট জনবহুল রাজ্য থেকেই এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন—দ্বিতীয় সংশোধনী সেটেলমেনট

পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন এবং তার বিভিন্ন সংশোধনীর দ্বারা বর্গাদারকে তার চাষের জমিতে অধিকারের সুরক্ষা এবং স্থায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্তদের ভূসম্পত্তি আগ্রাসনের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া জমির ঊর্ধ্বসীমা পরিবারভিত্তিক করা হয়েছে ও সাধারণভাবে কমানো হয়েছে। এই সব বিধানকে রূপ দেওয়ারজন্য একটি সংশোধনী সেটেলমেন্ট চলছে। অকৃষিজমিতে ভূমি সংস্কার আইন প্রযোজ্য নয় বলে ১৯৪৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের সাহায্যও এই জরিপে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালে হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলায় এই কাজ শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে প্ল্যান স্কিম হিসাবে অন্যান্য জেলায়ও এই কাজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বাকি থাকে শুধু কলকাতা, পুরুলিয়া জেলা, ইসলামপুর মহকুমা ও আসানসোলের খনি অঞ্চল। কলকাতা ছাড়া এই বাকি তিনটি অঞ্চলেও এ কাজ সম্প্রতি চালু হয়েছে। পুরনো জমাভিত্তিক স্বত্বলিপির বদলে প্রতিটি জেলায় ব্যক্তি ভিত্তিক স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা এই সেটেলমেনটের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

পাইলট প্রজেক্ট

১৯৭৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৬ সালের মে পর্যন্ত একটি পরিকল্পনা নিয়ে তার রূপায়নের ভার এই অধিকারের পর ন্যস্ত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল:—

১) সমাহর্তাদের কাছে বকেয়া কয়েক লক্ষ নামজারির দরখাস্তের ফয়সালা করা;

২) ভূমি সংস্কার আইন—অনুযায়ী উদ্বৃত্ত জমি সরকারে বর্তানো; এবং

৩) উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন চাষীদের বিলি করা। দ্বিতীয় কাজটি এখনও এই অধিকারের হাতেই থেকে গেছে।

'দি রেস্টোরেশন অব অ্যালিয়েনেটেড ল্যান্ড্ অ্যাক্ট

১৯৭৭ সাল থেকে এই আইন অনুযায়ী অভাবে পড়ে হস্তান্তর করা জমি হস্তান্তরকারীকে ফেরৎ দেওয়ার কয়েক হাজার দরখাস্ত এই অধিকারের অধীন আধিকারিকেরা ফয়সালা করেছেন।

অপারেশন বর্গা

১৯৭৮ সালে দেখা হল, প্রায় তিন লক্ষ বর্গাদার তখন পর্যন্ত পঞ্জীভুক্ত হলেও উৎখাতের প্রচেষ্টার সাথে তাল রাখতে আরও দ্রুত পঞ্জীকরণের প্রয়োজন আছে। বহুযুগের সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাসের জন্য অনেক বার্গাদার নাম লেখাতে আগ্রহী নন, তাঁদেরও অবহিত এবং উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন আছে।

তাই চালু হল অপারেশন বর্গা। পঞ্চায়েত এবং কৃষক সংগঠনগুলির সাহায্যে বেছে নেওয়া হল এমন সব গ্রাম, যেখানে বেশ কিছু বর্গাদার তখনও নাম লেখান নি। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় বর্গাদারদের সুবিধাজনক জায়গায় সভা করে তাঁদের অধিকার ব্যাখ্যা করে নাম লেখানোর দরখাস্ত করতে উৎসাহ দেওয়া হল। দরখাস্ত সংগ্রহ করে সেগুলি ২।৩ দিনের মধ্যে ফয়সালা করে বর্গাদারদের নাম স্বত্বলিপিতে তোলা হল। এই পদ্ধতিতে আশাতীত সাফল্য পাওয়া গেল, যার ফলে এখন পর্যন্ত তেরো লক্ষের উপর বর্গাদারদের নাম স্বত্বলিপিতে তোলা সম্ভব হয়েছে।

রি-আরটেনশন শিবির

একই সময়ে গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নবচেতনা জাগ্রত করতে আর একটি কর্মসূচী নেওয়া হয়। জেলায় জেলায় শিবির করে গ্রামের কিছু গরীব লোক ও সরকারি আধিকারিকেরা একত্র থাকতেন। গ্রামের গরিবদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে উৎসাহ দেওয়া হত। শিবিরের শেষে তাঁরা এক নূতন সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরতেন।

বাস্তুজমির অধিকার দান

১৯৭৫ সালের একটি আইনের বলে ভূমিহীনেরা অন্যের জমিতে বাস্তু করে থাকলে তার স্বত্বস্বামিত্ব পাবেন। ১৯৭৮ সালে এই অধিকার সাব্যস্ত করে স্বত্বলিপিতে তোলার ভার ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকারের পর পড়ে। এর ফলে লক্ষাধিক এই সুযোগ পেয়েছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ ও লাইব্রেরি

এই অধিকার থেকে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে যা গবেষক ও ঐতিহাসিকদের কাছে অপারেশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ একশো বছরে ধীরে ধীরে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছে, যার পুস্তক সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার।

মানচিত্র ছাপা

আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ মানচিত্র ছাপানো। প্রায় সত্তর হাজার শিটে মৌজা ম্যাপ, এবং এ ছাড়া থানা ম্যাপ, জেলা ম্যাপ , রাজ্য ম্যাপ এবং নানা রকমের বিশেষ ম্যাপ এখানে ছাপা হয়।

শস্যসমীক্ষা

১৯৮০ সাল থেকে এই অধিকারের কর্মীরা বাছাই করা মৌজায় প্রতিটি দাগের ভূমিব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য সরেজমিনে সংগ্রহ করে কৃষি বিভাগকে দিচ্ছেন। এই বছর রাজ্যের শতকরা ১৮ ভাগ এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ক্রমে এই সংখ্যা বাড়িয়ে শতকরা পঁচিশ ভাগে নিয়ে আসা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি বেদাত রাজস্ব আইন

ঔপনিবেশিক আমলের অবৈজ্ঞানিক রাজস্ব পদ্ধতির পরিবর্তে একটি সুষ্ঠু পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে এই আইনে। রাজস্বকে করা হয়েছে জমির মূল্যের সাথে সম্পর্কিত। ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকর্তার উপর প্রতি জেলার কাছাকাছি মূল্যের শ্রেণীর জমিগুলি সংঘবদ্ধ করে এক একটি এরিয়া বলে ঘোষণা করার ভার ন্যস্ত ছিল। এ কাজ যথাসময়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। আর ছিল রায়তদের দেওয়া রিটার্ণগুলি গ্রহণ করার ভার। সম্প্রতি এসেছে গৃহীত রিটার্নগুলি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার। এ কাজ চলছে।

বার্ষিক সার্ভে ও সেটলমেন্ট্ শিবির

প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আধিকারিদের জমির আইন, স্বত্বলিপি এবং জরিপ শেখানোর জন্য একটি চার মাসের শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এই শিবিরে প্রশিক্ষণ আধিকারিকদের ভবিষ্যত দায়িত্ব পালনে মূল্যবান পাথেয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ

পাশ্ববর্তী অঙ্গরাজ্য ও নেপালের সাথে সীমান্ত চিহ্নিত করা এই অধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

নির্বাচন

১৯৭১ সাল থেকে নির্বাচনের গুরুদায়িত্বও এই অধিকারের উপর অর্পিত হয়েছে। বর্তমানে এই অধিকারের উপ-অধিকর্তারা ক্ষতিপুরণ, কবিতীর্থ, আলিপুর, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এবং বিধানসভা টালিগঞ্জ নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক। অধিকর্তা ঐ চারটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের এবং কলিকাতা(দক্ষিণ) লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের জেলা নির্বাচন আধিকারিকও বটে।

সার্ভে ইনস্টিটিউট

এই অধিকারের পরিচালনায় হুগলী জেলার ব্যানডেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট বলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে জরিপের একটি দু বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। এই সার্টিফিকেট কোর্সকে ডিপ্লোমা কোর্সে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে।

প্রশিক্ষণ ও বিশ্লেষণ

এই অধিকারেরা কর্মীরা কাজ করেন গ্রামে গঞ্জে, কৃষকসাধারণের কাছের মানুষ হিসাবে। তাঁদের কাজের বিষয়বস্তু জমিজমা, যা-গ্রামের চাষীর প্রাণের জিনিস। স্বভাবতই তাদের হাতে আসে অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। এই তথ্যের আংশিক ব্যবহার করে বুদ্ধিজীবীরা এবং বিভাগীয় বিশেষজ্ঞরা কিছু চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু সে ব্যবহার আংশিক মাত্র। ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই তথ্য ভাণ্ডারের আরও সুষ্ঠু ব্যবহারের চেষ্টায় অধিকারের সদর অফিসে একটি সেল খোলা হয়েছে সম্প্রতি। এই সেলের অন্যতম কাজ হবে বর্তমানে একজন মাত্র আংশিক সময়ের কর্মীর দ্বারা রক্ষিত গ্রন্থাগারের সুবিন্যাস।

এই সেলের আর একটি কাজ হবে প্রশিক্ষণ সূচীর পুনর্গঠন। বস্তুত প্রশিক্ষণ এমনিতেই এই অধিকারের কাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে চাকুরি প্রশিক্ষণ দিয়ে শুরু হয় এবং চাকুরির মাঝে মাঝেও নূতন করে প্রশিক্ষণ হয়।

ম্যানেজমেন্ট্ ও সেটেল্‌মেনট্ শাখার একীকরণের যে বিরাট কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার জন্যও বড় একটি প্রশিক্ষণের কর্মসূচী হাতে নিতে হবে, যার কাজ ইতোমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। এই সব প্রশিক্ষণের একটি দৃঢ় নিবদ্ধ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে সাহায্য এই সেলের অন্যতম দায়িত্ব।

সংগঠন

এই বিচিত্র ও ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার মুলে আছেন প্রায় ১৮০০০ কর্মী যাঁরা রোদে জলে ঘুরে দুর্গম গ্রাম-গঞ্জে বনে-পাহাড়ে কষ্ট বরণ করে কাজ করেন, অধিকারের সমস্ত সাফল্যই যাঁদের নিষ্ঠার ফসল। এঁদের নিয়ে অধিকারের সংগঠন সংক্ষেপে বলছি। নিচের ছকগুলি থেকে সংগঠনটির কাঠামো বোঝা যাবে।

১ নং ছক

ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকর্তা

- ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকারের সদর অফিস
- অংকন ও তিবোমাপ শাখাদ্বয়
- অপারেশন সদর কার্যালয়(৮)
- পশ্চিমবঙ্গ সার্ভে ইনস্টিটিউট, ব্যানডেল
- শহর জমির উর্ধ্বসীমা অধিকার(১২ বি, রাসেল স্ট্রিট কলিকাতা)

২ নং ছক

অপারেশন সদর কার্যালয়

আযুক্তি অফিস

- জমিদারি গ্রহণ আইনের শিবির
- মন্ডল শিবির
- হল্কা শিবির

সদর কার্যালয়ে অধিকর্তাকে সাহায্য করেন তিনজনে উপ-অধিকর্তা, তিনজন সহ অধিকর্তা, একজন স্বকীয় সহায়ক একজন স্পেশ্যাল অফিসার ও একজন অধীক্ষক সহ কর্মীবৃন্দ। আর একজন উপ-অধিকর্তা (জরিপ) তাঁর সহ-অধিকর্তা সহ অংকন ও তিরোমাপের পরিচালনা করেন এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে অধিকর্তাকে পরামর্শ দেন। শহরের জমির ঊর্ধসীমা অধিকারের তদারকি করেন আর একজন উপ-অধিকর্তা। সার্ভে ইনস্টিটিউটে আছেন অধ্যক্ষ ও তার সহকর্মীগণ। এক বা একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত অপারেশনগুলির ভারপ্রাপ্ত ভূ-বাসন আধিকারিকেরা। প্রতিটি অপারেশন কয়েকটি আযুক্তিতে ভাগ করা থাকে, যার ভারপ্রাপ্ত ভূ-বাসন আধিকারিকেরা। প্রতিটি অপারেশন কয়েকটি আযুক্তিতে ভাগ করা থাকে, যার ভারপ্রাপ্ত আযুক্তি আধিকারিকেরা। মণ্ডল এবং জমিদারি গ্রহণ আইনের শিবিরের ভারপ্রাপ্ত এস, আর, ও, টু-রা। হল্কাশিবির থেকেই হয় জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রণয়ণের প্রাথমিক কাজ।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

শতবর্ষের পথসীমায় আমাদের যাত্রাপথ নূতন মোড় নিয়েছে। এতদিন ভূমি সংস্কারে কাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিল। ন্যস্ত স্বত্বের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, রাজস্ব আদায় এবং সরকারি ভূমি-বণ্টনের ভার ছিল জেলা সমাহর্তাদের উপর, অন্য কাজের ভার ছিল এই অধিকারের উপর। এখন এই দ্বৈতব্যবস্থা দূর হতে চলেছে। একই সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্থায়ী অফিস প্রতিষ্ঠিত করে ভূমি সংস্কারকে জনগণের দরজায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নামজারির ব্যবস্থা ও আনুষাঙ্গিক মানচিত্র এই সব অফিস থেকে দ্রুততার সঙ্গে করা হবে, যার ফলে ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য সংশোধনী সেটলমেনটের প্রয়োজন ভবিষ্যতে হয়ত হবেনা।

প্রতি জেলায় ভূমিসংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে থাকবেন অতিরিক্ত জেলা শাসক পদমর্যাদার একজন জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক। তাঁর নীচে মহকুমা ও পঞ্চায়ত সমিতি স্তরেও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা থাকবেন। পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সাহায্য করবেন তিনজন রাজস্ব কর্মচারী-একজন দেখবেন জরিপ ও স্বত্বলিপির কাজ, একজন আধা-বিচার বিভাগীয় কাজ আর একজন রাজস্ব আদায় ও খাসজমি বিলির কাজ। এঁদের নীচে গ্রাম পঞ্চায়েতের পর্যায় থাকবে রেভিনিউ ইনস্পেকটরের কার্যালয়।

উপসংহার

শতাব্দীর পথ পার হয়ে একবার পেছনে তাকানো যেতে পারে, তারপর আবার যাত্রা শুরু। আমাদের সঙ্গী রইল দীর্ঘ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার অভিজ্ঞতা আর নূতন দিনের প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দেওয়ার নিষ্ঠা।

গ্রামীণ সংবাদ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের উদ্যোগে কৃষি উপকরণ পক্ষপালন

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক মশাট ও মুণ্ডলিকা শাখাদ্বয় স্থানীয় সরকারি পঞ্চায়েত প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগে গত ১৮ অক্টোবর মশাট আপতাপ মিত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের জাতীয় কৃষি উপকরণ পক্ষ উপলক্ষে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চণ্ডীতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রী গোকুল চট্টোপাধ্যায়। আলোচনা চক্র উদ্বোধন করেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের অধিকর্তা শ্রী এস. পি. কৃষ্ণস্বামী। এই আলোচনা চক্রে চণ্ডীতলা-১ নং ব্লক ও জাঙ্গীপাড়া ব্লকের ফুরফুরা ও মুণ্ডলিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের হুগলি জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রী শচীন সেন কৃষি উপকরণ পক্ষপালনের তাৎপর্য বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। কৃষি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দও এই সভায় কৃষি উপকরণ ব্যবহারের প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন আলোচনার পরে উপস্থিত কৃষকরা সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

পরিবেশ দূষণ ও স্বল্প সঞ্চয় বিষয়ে আলোচনা চক্র

রায়গঞ্জ ২৯ অক্টোবর ১৯৮৪ স্থানীয় দক্ষিণে দেবীনগর বিদ্যালয়ে রায়গঞ্জ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহযোগিতায় স্বল্প সঞ্চয় ও পরিবেশ দূষণ এবং তার প্রতিকার নির্ণয়ের ওপর একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তাসহ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপলক্ষে স্থানীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তন সম্পর্কিত পোস্টার প্রদর্শনী করে। অনুষ্ঠানে রায়গঞ্জ পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার শ্রী সুনীল ধর মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

স্বল্প সঞ্চয় বিষয়ে স্থানীয় মহারাজা জগদীশ নাথ হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বক্তব্য রাখেন। স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে দেশ গঠনর বৃহত্তর সম্ভাবনা সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জনমত গঠনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। দেশের জনসংখ্যার বিরাট অংশকে এখনও এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই। এ সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি দ্বিবিধ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক শ্রী প্রীত্যেশ চন্দ্র সাহা প্রধান শিক্ষক দক্ষিণ দেবীনগর বিদ্যালয়, মহাশয় পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। কলকারখানা বিভিন্ন যানবাহন ইত্যাদির মাধ্যমে কিভাবে পরিবেশ দূষিত হয় সে সম্পর্কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। বৃক্ষরোপন, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা এবং দেশের যুবসমাজকে এ সম্পর্কে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। শ্রী গুরুদাস মন্ডল মহাশয় স্বল্প সঞ্চয় ও পরিবেশ উভয় বিষয়েই আলোচনার অংশগ্রহণ করেন। সকল বক্তাই এ ধরনের আলোচনা চক্রের ব্যপক প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, আলোচনাচক্র শেষে স্থানীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জরিপের ইতিহাস

শ্রী কৃষ্ণপদ শাণ্ডিল্য (শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে)

গোড়ার কথা

আমাদের কৃষিনির্ভর সমাজে ভূমি জরিপের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ ক'রে ভূমির দখল ও অধিকার ভিত্তিক জরিপ, যার ইংরেজি নাম ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, কৃষকের অধিকার সুরক্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি লেখ্য ও জরিপ অধিকারের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই রাজ্যে জরিপের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাসঙ্গিক হবে।

সম্রাট আকবরের সময় টোডরমলের বিখ্যাত জরিপ এই বাংলাতেই হয়েছিল। কিন্তু তারপরের দু'শো বছরে জরিপের কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। আধুনিক জরিপ এদেশে চালু হয় ইংরেজ আমলে, পলাশীর যুদ্ধের প্রায় অব্যবহিত পরে। তারপর থেকে দু'শো বছরের উপর জরিপের ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন। কাল এবং চরিত্র অনুসারে এই ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ–

১) ১৭৬৪–১৭৯৩; ঔপনিবেশিক শক্তির প্রশাসনিক বাণিজ্যিক এবং সামরিক প্রয়োজনে প্রধানত: এইসব জরিপ করা হয়েছিল।

২) ১৭৯৩–১৮৮৮; এইসব জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী সীমানা এবং এলাকা নির্ণয়, রাজস্ব বাড়ানো এবং নির্দিষ্ট করা, এছাড়া শহর, নদী, প্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত ইত্যাদি চিহ্নিত করা। এই সময়কে বৃটিশ শাসন প্রসারিত ও সংহত করার যুগ বলা যেতে পারে।

৩) ১৮৮৮–১৯৩৯; প্রত্যেক মৌজার বিস্তারিত মালিকানাভিত্তিক মানচিত্র এবং মালিকানাও দখলের বিবরণ করা এইসব জরিপের উদ্দেশ্য ছিল।

৪) স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ; এই সময়ে জরিপগুলি মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তমান স্বত্ব ও দখল সঠিকভাবে দেখানো এবং ভূমি সংস্কারের রূপায়ণ।

এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভের দ্বারা দেশের ভৌগলিক রূপরেখার বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক পরিচয় নির্দিষ্ট হয়েছিল। এরই সাথে সাথে চলেছে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ জরিপ, যেমন চর জরিপ। ১৮৮৫ সাল থেকে আঞ্চলিক জরিপে ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকার একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষত:, তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের জরিপের সম্পূর্ণ ভারই-এই অধিকারের উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রথম পর্যায় (১৭৬৪–১৭৯৩)

১৭৬৪–১৭৭৭ সালে মেজর জেমস রেনেল বাংলার প্রধান নদীপথগুলি জরিপ করেন। রেনেল এদেশে জরিপের প্রধান পথিকৃৎ। এই জরিপের কাজে থিওডোলাইট যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা ছিল এদেশে প্রথম। বাংলা বিহার ও যুক্ত প্রদেশের প্রায় ২৭০০০ বর্গমাইল এলাকা এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জরিপের মানচিত্রগুলি ৩৫, গোপালনগর রোডে ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকারের কার্যালয়ে রাখা আছে। এই মানচিত্রগুলি নদীপথের পরিবর্তমান চরিত্র জানবার জন্য মূল্যবান এবং অপরিহার্য দলিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে–নদী জরিপের মত জটিল কাজে আগে হাত দেওয়া হ'ল কেন। এর উত্তর খুব কঠিন নয়। নদীপথই তখন যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন ছিল। কাজেই সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন ছিল নদীপথের সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থও এর সাথে জড়িত ছিল।

ইংরাজ শাসন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কলিকাতা মহানগরীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে যায়। এই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের আংশিক জরিপ করেন লেফ্‌টেন্যান্ট্ কর্ণেল মার্কউড (১৭৮৪-৮৫) এবং টি: কল (১৭৮৬)

দ্বিতীয় পর্যায় (১৭৯৩–১৮৮৮)

১৭৯৩ সালে এল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদারেরা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত খাজনা দেওয়ার কড়ারে মালিক বনে গেলেন। মহালের এলাকা ও সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণের প্রয়োজনে জরিপ হ'ল। প্রথমে হ'ল থাক জরিপ। গ্রামের সীমানার বাঁকে বাঁকে থাক বা মাটির ঢিবি তৈরি ক'রে মানচিত্র আঁকা হ'ল। এই জরিপ খুব সূক্ষ্ম না হ'লেও পরের জরিপ রেভিনিউ সার্ভের জন্য খুব কাজের হয়েছিল। এই রাজ্যে রেভিনিউ সার্ভে চলে ১৮৩৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত। এ-সময় থিওডোলাইটের ব্যবহার চালু হয়। রেভিনিউ মানচিত্রের নকল এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এখনও এই অধিকারের করণে রাখা আছে। জেলা ও রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের জন্য এখনও এ মানচিত্র অমূল্য।

বন কেটে বসত হচ্ছিল সুন্দরবনের। এর জন্য সুন্দরবন জরীপ করলেন আলেকজান্ডার জে (১৮২৯-৩১)। এখনও বনের সীমানা মানচিত্রে হজের লাইন ব'লে পরিচিত।

বাংলার গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে হ'য়েছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৬৭ সালে মধ্যে। এটি অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং বিজ্ঞানসম্মত জরিপ। এই জরিপের সময় স্থাপিত স্তম্ভ পরবর্তী সব জরিপের প্রারম্ভিক নিশানা হিসাবে ধরা হয়।

এই সময়ের আর একটি প্রধান জরিপ দিয়ারা সার্ভে (১৮৬২-৮৩)। রেনেলের জরিপের পর বহু প্রধান নদীর খাত পরিবর্তন হওয়াতে এই জরিপের প্রয়োজন হয়। এ-ছাড়া অন্যান্য প্রশাসনিক জরিপও করা হ'য়েছিল। এর মধ্যে ১৮৪৭-৪৯ এবং ১৮৮৭-৯৩ সালের কলকাতা জরিপ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ভারত-নেপাল সীমানা জরিপও এই সময়েই হয়।

তৃতীয় পর্যায় (১৮৮৮-১৯৪৭)

আগেই বলা হ'য়েছে এই অধিকারের জন্ম ১৮৮৪ সালে। তখন এর নাম ছিল ভূমি লেখ্য ও কৃষি অধিকার। এই দপ্তর স্থায়ীভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন সম্বন্ধে তখন সরকার নিশ্চিত ছিলেন না। প্রথমে মজফ্‌ফরপুর এবং পরে অন্যত্র পরীক্ষামূলক জরিপের পর অধিকারকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রথমদিকে আলাদা জরিপ অধিকার থাকায় জরিপের ব্যাপারে কিছুটা দ্বৈতপ্রশাসন ছিল। পরে ১৯২৪ সালে পরিমাপ অধিকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেয়ে তা' ভূমি লেখ্য অধিকারের অঙ্গীভূত হয়।

এই সময়ের প্রধান কাজ ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ (১৮৮৮-১৯৩৯)।

এই জরিপের প্রেক্ষাপট এবং পরিধি সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার হ'লেন মালিক। সরকার তাঁদের কাছেই রাজস্ব নিতেন; প্রজাদের বসানো, তুলে দেওয়া, খাজনা বাড়ানো–এসব ব্যাপারে তাঁদের ছিল অপ্রতিহত অধিকার। অত্যাচারের অস্ত্র তাঁদের ছিল অজস্র, ক্ষমতা ছিল প্রায় বল্গাহীন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে এ নয়, তবে এটুকু বলা প্রাসঙ্গিক হবে, যে সরকারের সাথে প্রজাদের সম্পর্ক প্রায় ছিলই না, জমিদারই ছিলেন প্রজাসাধারণের ভূমিব্যবস্থার মালিক।

কাজেই সরকারের খাস জমি এবং কিছুটা অস্থায়ী ইজারার মহল (টেম্পোরারিলি সেট্‌ল্‌ড্‌ এস্টেট) ছাড়া অন্যত্র পূর্বের জরিপের লক্ষ্য ছিল শুধু জমিদারি মহলের এবং গ্রামের সীমানা এবং জমিদারের কাছে থেকে প্রাপ্য রাজস্ব নির্দেশ করা। সাধারণ প্রজার সাথে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

বহু প্রতিবাদ ও আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এল ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এই আইনে রায়তের শ্রেণীবিভাগ করা হ'ল এবং বিভিন্ন ধরনের রায়তের বিভিন্ন রকম স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। এই ব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রয়োজন হ'ল জমির স্বত্বদখলের বিস্তারিত পঞ্জীকরণ। তাই সংশ্লিষ্ট জরিপের নাম ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ। Cadastre একটি ফরাসী কথা, যার অর্থ পঞ্জী। প্রত্যেক টুকরো জমির উপর স্বত্ব ও দখলের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এবং মানচিত্রে প্রত্যেক খন্ড জমির সীমানির্দেশ এই জরিপে করা হয়েছিল। তখনকার অখন্ড বাংলার একটার পর একটা জেলায় এই জরিপ করা হয়েছিল বলে একে জেলা জরিপও বলা হয়।

এই জরিপের বিশাল পটভূমি ও বিস্তার কয়েকটি তথ্য দিলে কিছুটা বোঝা যাবে। অধুনা খন্ডিত পশ্চিমবঙ্গের এলাকাতেই আছে বিয়াল্লিশ হাজারের উপর মৌজা, যার মানচিত্র ধরা আছে প্রায় সত্তর হাজার শিটে। একটি মানচিত্রে আছে গড়ে প্রায় পাঁচশো দাগ বা ভূমিখন্ড। বলা বাহুল্য, তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির এলাকা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছিল। এই জরিপের কাজ ছিল প্রতিটি ভূমিখন্ডকে নিখুঁতভাবে মানচিত্রে তুলে ধরা, প্রতিটি ভূখন্ডের উপর জমিদার বিভিন্ন উপস্বত্বভোগী রায়ত ও তদধীন প্রজাদের অধিকার ও দখলের অনুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ করা; প্রতিটি দাগের ভূ-ব্যবহার, সেচ, ফসল, শ্রেণী-বিভাগ দেখানো; গোচর ইত্যাদি ভূমিতে জনসাধারণের ঐতিহ্যবাহিত অধিকার তুলে ধরা; বিভিন্ন স্তরের খাজনা ও রাজস্বের বিবরণ; প্রতিটি কৃষকের গোমহিষাদির ফর্দ; ইত্যাদি। এককথায় এই জরিপ ছিল সর্বার্থসাধক, যাতে কোটি কোটি দাগের ভৌগোলিক অবস্থান, শ্রেণী ব্যবহার ও তার উপর প্রজাস্বত্বের বিভিন্ন স্তরের সবগুলি দিকের সম্পূর্ণ বিবরণের একটি কোষ রচনা হ'য়েছিল। তাৎক্ষণিক ব্যবহারিক প্রশাসনিক প্রয়োজন ছাড়াও এই জরিপ গবেষকদের অফুরন্ত আকর। পরবর্তী জরিপগুলিতে এই আদর্শই অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এই জরিপের মানচিত্রগুলি পরবর্তী সমস্ত জরিপে মৌলিক কাঠামোর কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত করবে।

১৮৮৮ সালে অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এই জরিপ শুরু হয়। শেষ হয় ১৯৩৯ সালে হাওড়া জেলায়।

কলিকাতা শহর ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের আওতার বাইরে ছিল। এই শহরের জরিপ স্বতন্ত্রভাবে করেন আর বি, স্মার্ট ১৯০৩-১৪ সালে। হাওড়া শহরের জরিপ করেন সি,ই,সি, জাড ১৯১৪-১৭ সালে। ক্যাডাস্ট্রাল জরিপে মৌজা মানচিত্রের স্কেল ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১৬ ইঞ্চি *M* ১ মাইল, অর্থাৎ ১ : ৩৯৬০। কলকাতা এবং হাওড়া জরিপের স্কেল ছিল ১ ইঞ্চি *M* ৫০ ফুট, অর্থাৎ ১ : ৬০০।

এবার প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে, কারণ একই প্রযুক্তি ও পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গ তথাপূর্ব ও উত্তরভারতে মোটামুটিভাবে এখনও অনুসৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিটি দাগের চিত্ররূপ মানচিত্রে তোলা এবং মৌজার মানচিত্র জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করা। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ঠিক্ এই ব্যবস্থা চালু নেই, সেখানকার পদ্ধতি দাগগুলির মাপজোক লিখে রাখা।

প্রথমে গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভের স্তম্ভগুলি নির্দেশক ধরে নিয়ে এগোনো হয়। তারপর থিওডোলাইট ট্রাভার্সের সাহায্যে মোটামুটি গ্রামের সীমানা বারবর মানচিত্রের একটি কাঠামো করা হয়। খুঁটিনাটি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় সাইট ভেন, অপটিক্যাল স্কোয়ার এবং গানটার চেনের সাহায্যে। ট্রাভাসের কাজ পরিচালনা করা এবং মানচিত্রে ট্রাভার্স স্টেশনগুলি তোলা হয়েছিল ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকারের সদর কার্যালয় থেকে। কিস্তোয়ার অর্থাৎ দাগগুলি মানচিত্রে তোলা হয়েছিল হল্কা শিবির থেকে। এই শিবিরগুলি জরিপ এবং স্বত্বলিপি প্রস্তুতির কাজে নিম্নতম স্তরে অস্থায়ী অফিস। এরপরে বিভিন্ন অন্তবর্তী স্তরে মানচিত্রগুলি একাধিকবার পরীক্ষিত ও সংশোধিত হ'য়ে আসত আবার অধিকার সদর কার্যালয়ে। সেখানে মৌজার আয়তন চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হত এবং মানচিত্র ছাপা হ'ত। গ্রামের মানচিত্র ছাড়াও থানা এবং জেলার মানচিত্রও ছাপা হ'ত। এখনও মোটামুটি এই পদ্ধতি চলে আসছে। ছাপা মানচিত্র জেলা সমাহর্তাদের কাছে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে নামমাত্র মূল্যে জনসাধারণ পেতে পারে।

চতুর্থ পর্যায় (১৯৪৭-)

স্বাধীনতার পর প্রজাস্বত্বের কাঠামো আমূল পালটে গেল। ১৯৪৯ সালে এল পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, যাতে অকৃষিপ্রজার স্বার্থ সর্বপ্রথম সুরক্ষিত হল। এল বর্গাদার আইন, কলকাতা ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইন। ১৯৫৪ সালে এল যুগান্তর সৃষ্টিকারী পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন। এই শেষ আইনে মধ্যস্বত্ব বিলোপ হ'ল। রায়তেরা সরাসরি সরকারের অধীনে জমির নিঃস্বত্ব মলিক হ'লেন। জমির ঊর্ধ্বসীমা স্থির হল এবং বাড়তি জমি গরিব চাষীকে বিলির উদ্দেশ্যে সরকার হাতে নিলেন। স্বভাবতই এই আইনকে সঠিক রূপ দেওয়ার জন্য নূতন জরিপের প্রয়োজন হ'ল। এই জরিপ ১৯৫৪ সালে আরম্ভ হয় এবং স্বত্বলিপি প্রণয়নসহ রাজ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চলে ১৯৫৮ সালে শেষ হয়। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে নানা কারণে কাজ ষাটের দশক পর্যন্তও চলে।

১৯৫৫ সালে ভূমিব্যবস্থাকে নূতন করে রূপ দেওয়ার জন্য এল পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন। ১৯৮০ পর্যন্ত নানা সংশোধনীর মধ্য দিয়ে এখন এ-আইন যে-রূপ দিয়েছে, তাতে এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে :

১) রায়তের অধিকার ও দায়দায়িত্ব নির্ণয়;

২) বর্গাদারদের অধিকারের সুরক্ষা;

৩) তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত রায়তের জমির হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ, তাকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য;

৪) কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা কমানো এবং তাকে পরিবার ভিত্তিক করা;

৫) নূতন ক'রে রাজস্ব নির্ধারণ;

৬) স্বত্বলিপি রচনার পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, যার দ্বারা একজন রায়ত বা অকৃষিপ্রজার একগ্রামে কৃষি বা অকৃষি জমির জন্য একটিই স্বত্বলিপির দলিল বা খতিয়ান থাকে।

স্বভাবতই এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য এবং তাছাড়াও হস্তান্তর, উত্তরাধিকার ইত্যাদি কারণে পরিবর্তনগুলি সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য আর একবার জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। ১৯৭২ সালে হুগলি, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলায় এই কাজ শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে কলিকাতা, পুরুলিয়া জেলা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা এবং আসানসোলের খনি অঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য সমস্ত অঞ্চলে এই কাজ সম্প্রসারিত হয়। কলকাতা ছাড়া অন্য বাকি থাকা অঞ্চলে পরবর্তীকালে এ কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

স্বত্বলিপি প্রণয়নের প্রদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী দুটি জরিপেই জরিপ বিষয়ে ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের পদ্ধতিই মোটামুটি অনুসৃত হয়েছে। ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের মানচিত্র সংশোধন করেই স্বাধীনতার পর নূতন মানচিত্র প্রস্তুত হয়েছে, যাতে ট্রাভার্সের প্রয়োজন কমে। এই দুটি জরিপকেই তাই সংশোধনী জরিপ বলা হয়।

এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) এবং নেপালের সাথে

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়

বাংলার ভূমি সংস্কার ও তার প্রেক্ষাপট

শ্রী পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ভূমির ইতিহাস এক কলঙ্কজনক শোষণের মর্মান্তিক গাথা। সামন্ততান্ত্রিক প্রভু ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের যুগপৎ অত্যাচারে কৃষক সাধারণের জীবন হয়ে ওঠে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন অর্থাৎ প্রকৃতই নিঃস্ব। অথচ হিন্দু ও মোগল যুগে ভারতে কৃষি জীবন ছিল উপরতলার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে বৃহৎভাবে মুক্ত স্বাধীন জীবন। রায়ৎ অর্থাৎ মেহনতী কৃষক প্রজা সরাসরি রাজ্যসরকারকে অথবা সামন্তপ্রভুকে রাজস্ব জমা দিত কিন্তু জমির মালিক মূলতঃ তারাই ছিল। হিন্দুযুগে দেখা যায় কৃষককে মোটামুটি উৎপাদিত ফসলের ১/৬ অংশ অথবা ১/৮ রাজস্ব হিসাবে দিতে হতো। মোঘল যুগে এই হারের সামান্য হেরফের ঘটলেও মোটামুটি উক্ত নীতিই অনুসৃত হয়। একমাত্র আলাউদ্দিন খিলজীর আমলে রাজস্ব বাড়িয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের ১/২ অংশ করা হয়। আলাউদ্দিন খিলজীর আমলে কৃষকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: 'ক্ষুদকস্ত' অর্থাৎ যারা যেখানে চাষের জমি সেখানেই বসবাস করে, 'পাইকস্ত' যারা অন্যগ্রামে বাস করে। রাজস্বের হার কৃষকের এই শ্রেণীর উপর অনেকখানি নির্ভর করতো। তুঘলক আমল থেকে আবার এই রাজস্ব কমিয়ে দেওয়া হয় এবং কৃষকের স্বার্থই সাম্রাজ্যের স্বার্থ হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলে রাজস্ব কমে ফসলের ১/১১ অংশ হয়। যাইহোক, অতীত ইতিহাস আজ উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করে যে ভারতে অগণিত মেহনতী রায়তই ছিল ভূমির যথার্থ মালিক এবং শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র রাজস্ব প্রদানের। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মুসলমান আমলে নানা ধরনের প্রশাসনিক স্তর সৃষ্টি হয় এবং জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই জমিদারদের নিয়োগ ও অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল না। জমিদারের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীকে নতুন করে সনদ নিতে হতো। তবে একথা ঠিক যে মোঘল আমলে শোষণের মাত্রা বেশ উচুপর্দাতেই বাঁধা ছিল এবং পরবর্তী তীব্রতম ব্রিটিশ শোষণের পথনির্দেশক।

ব্রিটিশরা ভারতের এক বিশাল অংশে অর্থাৎ সুবে বাংলায় অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের নিযুক্ত কর্মচারী ও ইজারাদারগণ নির্মমভাবে কৃষকের বুকের রক্ত শুষতে থাকে, যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। সুবে বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানে রূপান্তরিত হয়। দিকে দিকে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। নানা আকারের কৃষকবিদ্রোহ দেখা দেয়। কোম্পানীর অভূতপূর্ব শোষণের অত্যাচারে অনেক পুরনো জমিদারও নিঃস্ব হয় এবং তারাও কৃষক বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই অবস্থার পরিবির্তনে কোম্পানি আনলো ভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। শুরু হলো ভারতীয় সামজিক অর্থনৈতিক জীবনে নতুন ইতিহাস।

১৭৯৩ খৃস্টাব্দে পূর্বতন সুবে বাংলা অর্থাৎ বিহার ওড়িশাঁ এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশে চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ। নির্দিষ্ট তৌজিভুক্ত সমুদয় জমিজমার ওপরে এই নবনিযুক্ত জমিদারদের মালিকানা ন্যস্ত হলো। চিরকালের মত এই শর্তে যে, সরকারি কোষাগারে দেয় রাজস্ব জমা দিতে হবে বাংলা বৎসরের শেষ তারিখের সূর্যাস্তের মধ্যে, অন্যথায় জমিদারী নিলাম করে দেওয়া হবে। জমিদাররা মালিক হওয়ার সাথে সাথেই ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরের ভূমি মালিকানার ইতিহাসে বিশাল পরিবর্তন হলো। কৃষকরা আর মালিক রইলো না। মাটির মালিক তারাই হলো 'মাটিতে যাঁদের পড়ে না চরণ'। এই মর্মান্তিক কাহিনীকে প্রমথ চৌধুরী তার 'রায়তের কথা'য় অতি মনোগ্রাহী করে প্রকাশ করেছেন—"যে সময়ে ফরাসী কৃষক সামন্ততন্ত্রের অবসান করে জমির মালিক হলো, সেই সময় বাংলার কৃষক তাদের দীর্ঘদিনের অধিকার হারালো।"

প্রথমেই বলা হয়েছে যে মোঘল আমলের অনেক জমিদার কোম্পানি আমলের প্রথম চোটের শোষণ সহ্য করতে না পারায় নিঃস্ব হয়ে যায়। যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেলো তারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলো না। এ কথা ঠিক যে রাজস্ব আদায়ে তারাও যথেষ্ট কড়াকড়ি করতো কিন্তু এই জাতীয় জমিদাররা মূলতঃ কৃষকদের মধ্যে বসবাস করায় কৃষক সমাজের সুখ দুঃখের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল তাই জমিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য

পশ্চিমবঙ্গে জরিপের ইতিহাস (শেষাংশ)

পশ্চিমবঙ্গের সীমানাও জরিপ করা হয়।

আগামীর ভাবনা

অনেক কাজ করা হয়েছে। এখনও অনেক কাজই বাকি আছে। কলকাতার জরিপ অনেকদিন করা হয় নি। বড় নদীগুলির জরিপ এবং সুন্দরবন অঞ্চলের জরিপও হয়ত আবার করা প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিস্তীর্ণ সংশোধনী জরিপের প্রয়োজন হয়ত আর হবে না। ভূমি-সংস্কারের কাজে এখন দুটি ভাগে হচ্ছে। এ-কাজের কিছু করছেন জেলা সমাহর্তারা, কিছু ভূমি লেখ্য ও পরিমাপ অধিকার। এই দুটি শাখার কাজ একীকরণ করে একই দৃঢ়নিবদ্ধ প্রশাসনের অধীনে আনার জন্য একটি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এর একটি অঙ্গ ভূমি সংস্কারের কাজকে জনমুখীন করে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তরে নিয়ে যাওয়া। এই পরিকল্পনা পুরো কার্যকরী হওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত-ভিত্তিক অফিসগুলিতেই হস্তান্তর ইত্যাদির জন্য মানচিত্রের অবিরত সংশোধন হবে, যার ফলে তৎকালীন অবস্থা সর্বদাই মানচিত্রে প্রতিফলিত থাকবে।

উপসংহার

অনেক কথাই বলা হয় নি। বিশেষ ক'রে ভারতীয় জরিপ সংস্থা যে টোপোগ্রাফিক্যাল জরিপ ক'রে যাচ্ছেন, তার কথা বলা হল না। তবু পরিসরের স্বল্পতা সত্ত্বেও একটা কথা না বললে কথা অসম্পূর্ণ থাকে। একশ বছর ধরে আমরা যা কিছু করছি, তার মূলে আমাদের অগণিত কর্মীরা, যাঁরা রোদে জলে অক্লান্ত শ্রম করছেন; যাঁরা গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে আছেন, যার অনেক জায়গায় দৈনন্দিন জীবনের সামান্যতম সুবিধাগুলিও মেলেনা। শতবর্ষের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আজ তাঁদেরই বেশী করে স্মরণ করছি, কারণ আমাদের যা কিছু সাফল্য, তা তাঁদেরই শ্রম ও নিষ্ঠার ইতিহাস। আর স্মরণ করছি সেই সব গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষকে, যাঁদের সবাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সঙ্গী।

যে নির্মম শোষণের প্রয়োজন তার প্রক্রিয়া এরা ঠিকমত জানতো না। ফলে তাদের অনেকেরই জমিদারী বিক্রয় হয়। সুবে বাংলায় নতুন জমিদার হয় শহরের ব্যবসায়ীরা। শহরের এক শ্রেণী ব্যবসায়ী ব্যবসা বাণিজ্য এবং ইংরেজ কোম্পানির মুৎসুদ্দিগিরি করে প্রভৃত ধন উপার্জন করে এবং সেই অর্থে তারা জমিদারী ক্রয় করে। তারা জমিদারী চালাতো শহরে থেকে ব্যবসায়ী কায়দায় এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করে ছোটবড় অসংখ্য পত্তনীদারদের। একজন পত্তনীদার আবার তার অধীনে দর পত্তনীদার এবং দর পত্তনীদার তস্য দর পত্তনীদার নিয়োগ করতো। সর্বনিম্নে অবস্থান করতো সত্যিকারের কৃষক। খাজনার হার ক্রমশঃই বাড়তে বাড়তে চাষীর কাজে পর্বত প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত হতো। কোম্পানি শাসক এই নয়া ভক্ত জমিদার শ্রেণীকে প্রায় যাবতীয় প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব প্রদান করে পরম নিশ্চিন্তে শোষণের নব নব দিগন্ত উন্মোচনে প্রয়াসী হয়। এমনকি জমিদার প্রজাকে কয়েদ করবার ও অনাদায়ী খাজনা আদায়ের জন্যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করবার অধিকার পর্যন্ত পায়। এই অবিসংবাদিত ক্ষমতার ব্যবহারে অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী জমিদার শ্রেণী ও তাদের বিশ্বস্ত পত্তনীদারেরা মোঘল আমলের রাজস্ব নির্ধারণের নিরিখকে কবরস্থ করে ইচ্ছামতো খাজনা আদায় করতে থাকে। খাজনা ছাড়া তারা সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে নানা অর্থ আদায় করতে থাকে 'আবওয়া' বলা হয়। আবওয়ারের বহর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯৪৬ সালে কৃষ্ণবিনোদ রায় মহাশয় এক তালিকা প্রদান করেন, তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো। (১) জোতদার গদীতে বসলে তাকে গদী সেলামী দিতে হবে, (২) ছেলের পড়ার খরচ বাবদ ধান দিতে হবে। (৩) অগ্রহায়ণমাসে নতুন ধান উঠলে নবান্ন উৎসবের ধান দিতে হবে।(৪) জমিদার পুত্র কন্যার বিবাহে ধান মাছ বা ছাগল দিতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে গদী-সেলামী, ছেলে পড়ানী, মাছ-খাওয়ানী, করালী, খলিয়ান, ঝাড়ানি ইত্যাদি আবওয়াবের চাপে কৃষক নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত।

ব্রিটিশরা ছিল মূলতঃ নব পুঁজিপতি শক্তির প্রতিভূ। জমি থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব সুনিশ্চিত করে এবং ভারতে তাদের কায়েমী শক্তিকে অটল রাখার প্রয়োজনীয় সাকরেদ অর্থাৎ জমিদার শ্রেণী তৈরি করে তারা বাণিজ্য প্রসারে নজর দিলো। এখানকার ঐতিহ্যমন্ডিত কুটির শিল্প ও বিশ্বশ্রেষ্ঠ তাঁত শিল্পকে আঘাত হানলো নানা কৌশলে এবং তাদের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের বাজার ছেয়ে ফেললো। ফলে কুটির শিল্প ও তাঁতশিল্পের বহু পরিবার জীবিকার জন্য জমিতে ভিড় করলো। মোঘল আমলে বিভিন্ন মনসবদার জায়গীরদার জমিদারের অধীনে সিপাহী পাইক বরকন্দাজ হিসাবে যারা কাজ করতো তারা কর্মচ্যুত হয়ে ফিরে এলো কৃষিতে। ফলে জমির উপর যথেষ্ট চাপ পড়তে থাকে এবং এই সুযোগে শোষণের কৌশল দৃঢ় হয়। বহু ব্যক্তি ক্ষেত মজুর, মুনিষ বা ভাগচাষী হিসাবে নিঃস্ব ছন্নছাড়া আধামানবিক জীবনের আবর্তে পড়ে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধানে প্রকাশ করা হয়েছিল যে জমির মালিকানা নিশ্চিন্ত হওয়ায় এবং রাজস্ব পূর্বনির্ধারিত থাকায় জমিদারেরা কৃষি উন্নতির সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহন করবে এবং ভারতের নিশ্চল কৃষি জীবনে গতির সঞ্চার হবে। কিন্তু এই সদিচ্ছা কার্যকরী হয় নি কারণ জমিদার ছিল মূলতঃ ব্যবসায়ী অথবা শহরবাসী। তারা জমিদারীর বিশাল উদ্বৃত্ত কিছুটা ব্যবসায়ে লাগিয়ে বাকীটা জলের মত ব্যয় করেছে চালাও বিলাস ব্যসনে। ফলে কৃষি থেকে গেছে সম্পূর্ণ পশ্চাদপদ। বন্যা, খড়া, পোকার আক্রমণ তো ছিলই এমনকি স্বাভাবিক বছরেও জমির সীমিত উৎপাদিকা শক্তি ও সেচের অভাবহেতু প্রয়োজনের তুলনায় কম শস্য উৎপাদিত হতো। এই ঘাটতি প্রায় মেটানো যেত আবাদযোগ্য অনাবাদী জমিকে সামান্য পরিচর্যা করে চাষের আওতায় আনলে, কিন্তু সেই সামান্য ব্যয় বহনেও জমিদার শ্রেণী পরান্মুখ ছিল।

ফ্লাইড কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে বাংলাদেশে ত্রিশের দশকে ২ কোটি একর আবাদী জমি থেকে ২৩ কোটি মন চাল উৎপাদিত হতো। অথচ প্রয়োজন ছিল ৩০ কোটি মন। অর্থাৎ বিঘা প্রতি উৎপাদন ছিল ৪ মনেরও যথেষ্ট কম এবং এই কমের প্রধান কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় সেচের অভাব ও অন্যান্য উপাদানের অনুপস্থিতি। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে ৩৭ লক্ষ একর আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি ছিল যা চাষে আনতে পারলে আরও ৫ কোটি মন অতিরিক্ত চাল উৎপাদনে সহায়ক হতে পারতো। এত অনাবাদী জমি পড়ে থাকলো শুধু এই কারণে যে জমির মালিক জমিদার জমি প্রস্তুতির জন্য ও প্রাথমিক চাষের জন্য এক পয়সাও খরচ করতে নারাজ। সে চায় কৃষকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে অথচ অনবরত কাঁঠাল ভাঙার ফলে তার মাথাও ভাঙা কাঁঠালের রূপ নিয়েছে। আর অবস্থা ওষ্ঠাগত ফলে তারপক্ষে জমি তৈরি করে চাষ করা সম্ভব হয় নি। কম উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন অপ্রচুর কৃষি জমির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি মজুরের মজুরী স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কারণে হ্রাস পেয়েছে এবং ভাগচাষীদের অবস্থাও সংগীন হয়েছে। কৃষিপ্রধান দেশে বিরাট সংখ্যক কৃষকরে মৃতপ্রায় অবস্থার জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় নি এবং সীমিত শিল্পের বাজার স্বভাবতই শিল্পোন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে নি। সমগ্র অর্থনীতির জরাগ্রস্ত অবস্থা কৃষক শ্রমিক সবারই হতাশা বাড়িয়েছে এবং সেই হতাশার স্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে কৃষক বিদ্রোহের রূপে ফেটে পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছে ভূমি রাজস্ব কমিশন বসাতে এবং কমিশন নির্দ্বিধায় চরম কুফল প্রসবকারী জমিদারী ব্যবস্থার অবিলম্বে বিলোপসাধন ও জমির ঊর্দ্ধতন সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করেন।

দেশের অভ্যন্তরে অশান্ত পরিবেশ, লাগাতর আন্দোলন ও বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতের মাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তখন ভূমি সংস্কার নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে এবং প্রত্যেক রাজ্যেই ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে পাশ হয় পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন; উদ্দেশ্য সমস্ত মধ্যস্বত্ব অধিকার বিলোপ। বিলুপ্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং জমি রাখার ব্যক্তিগত অধিকারের সীমা নির্দ্ধারণ, সীমা বহির্ভূত জমি সরকারে বর্তানো ও জমির মালিকের সাথে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন। ১৯৫৫ সালে পাশ হয় পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন যাতে সরকারায়ত্ব জমি ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও অতিক্ষুদ্র চাষীর মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা হয়। ভারত স্বাধীন হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল সামন্ত প্রভুদের হাতে, ফলে তারা আইন পাশ করলে ও আইনকে বাস্তবায়িত করতে আদৌ আগ্রহী ছিল না। বিড়াল দিয়ে মাছ ভাগের যে পরিণতি হয়, তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে ভূমি সংস্কার আইন রূপায়ণে একই পরিণতি ঘটে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার তৎপরতায় অত্য সব প্রচেষ্টা চাপা থাকে। আইনের সদিচ্ছা সত্ত্বেও বহু জমির মালিক আইনের ফাঁক ফোঁকরের সাহায্যে সীমাবহির্ভূত বহু জমি আঁকড়ে রাখে, অজস্র জমি বেনামী করে এবং সরকারের হাতে জমি সমর্পনের আদেশের বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে বিভিন্ন বিচারালয়ে আবেদন জানিয়ে স্থিতির আদেশ পায়। জমিদারী অধিগ্রহণ আইনে জমিকে নানা ভাগে ভাগ করা হয় যেমন (১) কৃষি (২) অকৃষি (৩) বাস্তু (৪) দালান ও কারখানা (৫) মেছো ঘেরি (৬) ফলের বাগান (৭) দেবোত্তর, পীরোত্তর ও অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জমি। এছাড়া চা-বাগান খনি ইত্যাদির জন্য জমির ভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস ধরা হয়। কৃষি অকৃষি ও বাস্তুর সীমা নির্ধারিত হয় বটে কিন্তু দালান, কারখানা, মেটোঘেরি, ফলের বাগান দেবোত্তর ইত্যাদির কোন সীমা নেই। ফলে রাতারাতি চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে মাছের ঘেরি করা হয় ফলের বাগানের এলাকা বর্ধিত হতে থাকে যদিও মাছ এবং ফল উভয়েরই বাজারে যোগান ক্রমহ্রাসমান।

এ কথা ঠিক যে ভারতবাসী ধর্মভীরু ও এশিয়ার মধ্যে ধর্মরপ্তানীতে ভারতে স্থান শীর্ষে কিন্তু এদেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জমির

মালিকরা যে কতখানি ধার্মিক তা জমিদারী অধিগ্রহণ আইন পাশ না হলে অবশ্যই বোঝা যেত না। প্রাক্তন জমিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী ও জোতদার শ্রেণীর ব্যক্তিরা অজস্রজমি অর্পণনামার মাধ্যমে দেবতাকে উৎসর্গীকৃত করে। অর্পণনামা সমূহের জ্বলের মত ভাষায় এই কথা বোঝানো হয় যে বিশ্ব মানবের হিতার্থেই তাঁরা তাঁদের সম্পত্তির এক বিরাট অংশ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেবায় অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট মানব জাতির কল্যাণে সমর্পণ করছেন। বহু অর্পণনামা সম্পন্ন হয়–জমি সরকারে বর্তানোর নির্দিষ্ট তারিখের পর অর্থাৎ সেগুলি বে-আইনি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেবাইত বা মোতয়ালী জমি অর্পণকারী পরিবারের কোন ব্যক্তি। ভারতীয় দর্শন সংক্ষেপে নিরাসক্তের দর্শন। দেবতাকে সমর্পণ করার পর সমর্পণকারী সম্পূর্ণভাবে সম্পত্তি থেকে বিমুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ এই সমস্ত সমর্পণে তারাই প্রত্যক্ষভাবে সেবাইতের ভূমিকা নিয়ে তথাকথিত ধর্মীয় বা দাতব্যক্রিয়া কলাপের বাতাবরণ সৃষ্টি করে সমগ্র সম্পত্তি পূর্ববৎ ভোগ দখল করতে থাকে। কিছু সাহসী রাজস্ব আধিকারিক রুখে দাঁড়ান এবং ঐ জাতীয় অর্পণনামা বা প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনি ঘোষণা করে জমি সরকারায়ত্ব করেন। কিন্তু আদালতে রাজস্ব অধিকারিকদের সিদ্ধান্ত নাকচ হয় এবং মানুষের তৈরি আইন বা মানুষের হাত ঈশ্বরের সম্পত্তি স্পর্শ করবে একথা অনেকে ভাবতেই পারেন নি। পরে অবশ্য মাননীয় উচ্চ আদালত কোন্ দেবোত্তর, পীরোত্তর বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের বলে চিহ্নিত হবে তার নিরিখ বেঁধে দেন এবং সেই আলোকে বিচার করে পরবর্তী কালে অনেক ঐ জাতীয় ভূ-সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত করা হয়। সেবাইত বা ট্রাস্টি নামধারী জমির মালিকেরা অবশ্য আবার আদালতে গেছেন এবং দিনের পর দিন আদালতে কেসের সংখ্যা বাড়ছে। তবে আদালতে তারা এখন কঠিন বিচারের সম্মুখীন হচ্ছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেবোত্তর বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কেসে সরকার জয়লাভ করেছেন।

উপরোক্ত ভাবে ছাড়া ও জমির মালিকরা বেনামে ও প্রচুর জমি লুকিয়ে রাখে এবং যেহেতু সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বৃহৎভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল তাই রাজস্ব আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা আইন রূপায়ণে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

১৯৬৭ সালে ভূমি সংস্কারে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গবব্যাপী বেনামীজমি উদ্ধারের, বে-আইনি মেছোঘেরি, ফলের বাগান ইত্যাদির অনুসন্ধান ও সরকারায়ত্ব কারণের প্রয়াস জোরদার করা হয়। আইনকে রূপায়িত করবার প্রয়োজনীয় ইচ্ছা ও বাতাবরণ তৈরি হয় এবং রাজ্যব্যাপী ভূমি সংস্কারের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। এই বিশাল ও জটিল কাজে ভুল ত্রুটি অনেক হয়েছে ঠিকই তবে সেই জোয়াদের চলমান শক্তির বলেই আজ পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারে ভারতের পথ প্রদর্শক।

১৯৬৭ সালের সরকারী নীতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ হয় জমিদারী অধিগ্রহণ আইনের দ্রুত রূপায়ণে। বিগত ১২ বৎসর যাবৎ যে আইন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রায় স্থবির হয়ে গিয়েছিল এক প্রবল ধাক্কায় তাকে সচল করে যতখানি সম্ভব জমি সরকারায়ত্ব কারর তড়িৎ গতিতে দখল নেওয়ার জোরদার প্রচেষ্টা চলে। ভূমি সংস্কারের এই উদ্দীপনা মোটামুটি প্রজ্বলিত, থাকে এবং ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনের মাধ্যমে ঊর্দ্ধসীমা ব্যক্তিভিত্তিক থেকে পরিবার ভিত্তিক করা হয় এবং ২৫ একর ব্যক্তিভিত্তিক সীমা ৭ হেক্টরে আনা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ক্ষেত্রে সীমা ৫ হেক্টর এবং ৫ এর অধিক সদস্য হলে প্রতি অতিরিক্ত সদস্যের জন্য .৫০ হেক্টর কিন্তু সর্বশেষ সীমা ৭ হেক্টরে নির্ধারিত থাকে। বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষারও ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বর্তমানে নথিভুক্ত বর্গাদারের অধিকার আইনের শক্ত ভিতের উপর দন্ডায়মান।

১৯৭৮ সাল থেকে ভূমি সংস্কারের কাজে এক নতুন দিক চালু করা হয়। ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকারের মানচিত্র সংশোধন ও ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক স্বত্বলিপি প্রস্তুতির কাজ ব্যতীত জমি সরকারে বর্তানো ও বর্গাদার নথিভুক্তির কাজে বিশেষ জোর দিতে বলা হয়। প্রায় একই সময় থেকে নথিভুক্ত বর্গাদারদের ও সরকারী জমি প্রাপকদের ব্যাংক থেকে সামান্য সুদে কৃষি ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা শুরু হলো। শুধুমাত্র খাস জমি বিলি করে ও বর্গাদারদের নথিভুক্ত কলরেতাদের অধিকার স্থিতি করা যায় না। এ অভিজ্ঞতা আজ দেশব্যাপী। অনেক খাস জমি প্রাপক দারিদ্রের জ্বালায় ও প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে জমি চাষ কলরতে পারেন নি। তাৎক্ষণিক ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য তাই পাট্টা জমি বিক্রয় করতে হয়েছে অথবা ঋণের দায়ে সেই জমি জোতদার বা মহাজনের কাছে চলে গেছে। সুতরাং বলা যায় ১৯৭৮ সাল থেকে ভূমি সংস্কারের প্রকৃত পথ নির্দেশিত ও অনুসৃত হতে শুরু হয়।

সারা ভারতে ভূমি সংস্কারের অবস্থা যখন খুবই বেগতিক পশ্চিমবঙ্গে তখন এই কাজ সমস্ত বাধা ঠেলে খাকিটা সফলতার পথে যেতে পেরেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী জমির ঊর্দ্ধসীমা আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সারা ভারতে ২১০ লক্ষ একর জমি সরকারের হওয়ার কথা তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৪১ লক্ষ একর সরকারের খাতায় এসেছে এবং তার মধ্যে ১৩ লক্ষ একর পশ্চিমবঙ্গের মত ছোটরাজ্যের। বিলিবন্টনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ অনেকখানি অগ্রসর। বর্গানথিভুক্তি ব্যাপারে যেখানে অন্যান্যরাজ্য বর্গাদারের অস্তিত্বই স্বীকার করে না পশ্চিমবঙ্গ শুধু তাদের স্বীকার করেছে তাই নয়, আইন প্রনয়ণ করে প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক সাহায্যে তাদের গ্রামীণ স্বত্বলিপিতে নথিভুক্ত করেছে। এ যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছে।

বর্গানথিভুক্তিতে যে নতুন স্কীম নেওয়া হয় তাকে 'অপারেশন বর্গা' নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে বলেন 'অপারেশন বর্গা' নামে হৈ চৈ না করে জরীপ বিভাগের স্বাভাবিক কাজের সময় বর্গাদারদের নথিভুক্ত করা ভালো ছিল। তাঁরা আরো বলেন–অহেতুক হৈ চৈ-এর জন্য বিষয়টিতে রাজনৈতিক গন্ধ এসে গেছে এবং প্রশাসনের সময় ও শক্তির অপব্যয় হয়েছে। কিন্তু যাঁরা গ্রামে কাজ করেন তাঁরা জানেন জোতদার মালিকের ব্যূহ ভেদ করে জরীপ বিভাগের সাধারণ কাজের সময় উপস্থিত হয়ে নাম নথিভুক্ত করা বর্গাদারদের পক্ষে কত কঠিন। স্বাভাবিক ভয় ছাড়া বগাদারদের মধ্যে নানা সংস্কার ও সংকোচ কাজ করে। এই সমস্ত ভেঙে তাকে সাহসী করার জন্য প্রয়োজন বর্গাদারকে যথাযথভাবে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা ও সংগঠনের মধ্যে এনে সাহসী করে তোলা। অপারেশন বর্গার পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্গা নথিভুক্তির প্রাক্কালে সান্ধ্যবৈঠক করা হয় যেখানে সরকারি কর্মচারী, পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দ ও কৃষক সংগঠন সমূহের দায়িত্বশীল কর্মীরা সমবেত ভাবে বর্গাদারাকে সাহস প্রদান করে ও তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। অতীতে দেখ গেছে যে বর্গাদার নথিভুক্ত হলেও সে তার অধিকার বজায় রাখতে পারে নি। যে সাংগঠনিক শক্তি ভূস্বামীর সংগে মোকাবিলা করতে একান্ত প্রয়োজন বর্গাদারদের পিছনে সেই সাংগঠনিক শক্তি ছিল না। কিন্তু এবার তারা নিজেরা অনেকখানি সংগঠিত এবং সামগ্রিকভাবে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত। দ্বিতীয়তঃ আইনের ভিতও অনেক শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক স্থাপিত টাস্ক ফোর্স পর্যন্ত সবাই কৃষকদের উন্নতির সোপান হিসাবে শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা তাঁদের ১৪১ নং কনভেনশজনে একই কথা বলেন এবং উন্নতিকামী এশীয় দেশ সমূহকে কৃষক সংগঠন জোরদার করতে আহ্বান জানান। নথিভুক্তির ব্যাপারে সংগঠনের ভূমিকা অভূতপূর্ব সাফলের দাবি রাখে। রাজস্ব আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু তাঁদের সর্বপ্রকার আন্তরিক প্রচেষ্ঠা উপযুক্ত সাফল্য লাভ করতে পারতো না যদি না কৃষক সংগঠন সমূহ এবং পঞ্চায়েত সততার সাথে এগিয়ে আসতো। অপারেশন বর্গার সাফল্য যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে

শেষাংশ ৪২১ পৃষ্ঠায়

মালিকরা যে কতখানি ধার্মিক তা জমিদারী অধিগ্রহণ আইন পাশ না হলে অবশ্যই বোঝা যেত না। প্রাক্তন জমিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী ও জোতদার শ্রেণীর ব্যক্তিরা অজস্রজমি অর্পণনামার মাধ্যমে দেবতাকে উৎসর্গীকৃত করে। অর্পণনামা সমূহের জ্বলের মত ভাষায় এই কথা বোঝানো হয় যে বিশ্ব মানবের হিতার্থেই তাঁরা তাঁদের সম্পত্তির এক বিরাট অংশ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেবায় অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট মানব জাতির কল্যাণে সমর্পণ করছেন। বহু অর্পণনামা সম্পন্ন হয়–জমি সরকারে বর্তানোর নির্দিষ্ট তারিখের পর অর্থাৎ 'সেগুলি বে-আইনি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেবাইত বা মোতয়ালী জমি অর্পণকারী পরিবারের কোন ব্যক্তি। ভারতীয় দর্শন সংক্ষেপে নিরাসক্তের দর্শন। দেবতাকে সমর্পণ করার পর সমর্পণকারী সম্পূর্ণভাবে সম্পত্তি থেকে বিমুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ এই সমস্ত সমর্পণে তারাই প্রত্যক্ষভাবে সেবাইতের ভূমিকা নিয়ে তথাকথিত ধর্মীয় বা দাতব্যক্রিয়া কলাপের বাতাবরণ সৃষ্টি করে সমগ্র সম্পত্তি পূর্ববৎ ভোগ দখল করতে থাকে। কিছু সাহসী রাজস্ব আধিকারিক রুখে দাঁড়ান এবং ঐ জাতীয় অর্পণনামা বা প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনি ঘোষণা করে জমি সরকারায়ত্ব করেন। কিন্তু আদালতে রাজস্ব অধিকারিকদের সিদ্ধান্ত নাকচ হয় এবং মানুষের তৈরি আইন বা মানুষের হাত ঈশ্বরের সম্পত্তি স্পর্শ করবে একথা অনেকে ভাবতেই পারেন নি। পরে অবশ্য মাননীয় উচ্চ আদালত কোন্ দেবোত্তর, পীরোত্তর বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের বলে চিহ্নিত হবে তার নিরিখ বেঁধে দেন এবং সেই আলোকে বিচার করে পরবর্তী কালে অনেক ঐ জাতীয় ভূ-সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত করা হয়। সেবাইত বা ট্রাস্টি নামধারী জমির মালিকেরা অবশ্য আবার আদালতে গেছেন এবং দিনের পর দিন আদালতে কেসের সংখ্যা বাড়ছে। তবে আদালতে তারা এখন কঠিন বিচারের সম্মুখীন হচ্ছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেবোত্তর বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কেসে সরকার জয়লাভ করেছেন।

উপরোক্ত ভাবে ছাড়া ও জমির মালিকরা বেনামে ও প্রচুর জমি লুকিয়ে রাখে এবং যেহেতু সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বৃহৎভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল তাই রাজস্ব আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা আইন রূপায়ণে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

১৯৬৭ সালে ভূমি সংস্কারে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বেনামীজমি উদ্ধারের, বে-আইনি মেছোঘেরি, ফলের বাগান ইত্যাদির অনুসন্ধান ও সরকারায়ত্ব কারণের প্রয়াস জোরদার করা হয়। আইনকে রূপায়িত করবার প্রয়োজনীয় ইচ্ছা ও বাতাবরণ তৈরি হয় এবং রাজ্যব্যাপী ভূমি সংস্কারের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। এই বিশাল ও জটিল কাজে ভুল ত্রুটি অনেক হয়েছে ঠিকই তবে সেই জোয়াদের চলমান শক্তির বলেই আজ পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারে ভারতের পথ প্রদর্শক।

১৯৬৭ সালের সরকারী নীতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ হয় জমিদারী অধিগ্রহণ আইনের দ্রুত রূপায়ণে। বিগত ১২ বৎসর যাবৎ যে আইন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রায় স্থবির হয়ে গিয়েছিল এক প্রবল ধাক্কায় তাকে সচল করে যতখানি সম্ভব জমি সরকারায়ত্ব কারর তড়িৎ গতিতে দখল নেওয়ার জোরদার প্রচেষ্টা চলে। ভূমি সংস্কারের এই উদ্দীপনা মোটামুটি প্রজ্বলিত থাকে এবং ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনের মাধ্যমে ঊর্দ্ধসীমা ব্যক্তিভিত্তিক থেকে পরিবার ভিত্তিক করা হয় এবং ২৫ একর ব্যক্তিভিত্তিক সীমা ৭ হেক্টরে আনা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ক্ষেত্রে সীমা ৫ হেক্টর এবং ৫ এর অধিক সদস্য হলে প্রতি অতিরিক্ত সদস্যের জন্য .৫০ হেক্টর কিন্তু সর্বশেষ সীমা ৭ হেক্টরে নির্ধারিত থাকে। বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষারও ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বর্তমানে নথিভুক্ত বর্গাদারের অধিকার আইনের শক্ত ভিতের উপর দন্ডায়মান।

১৯৭৮ সাল থেকে ভূমি সংস্কারের কাজে এক নতুন দিক চালু করা হয়। ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকারের মানচিত্র সংশোধন ও ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক স্বত্বলিপি প্রস্তুতির কাজ ব্যতীত জমি সরকারে বর্তানো ও বর্গাদার নথিভুক্তির কাজে বিশেষ জোর দিতে বলা হয়। প্রায় একই সময় থেকে নথিভুক্ত বর্গাদারদের ও সরকারী জমি প্রাপকদের ব্যাংক থেকে সামান্য সুদে কৃষি ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা শুরু হলো। শুধুমাত্র খাস জমি বিলি করে ও বর্গাদারদের নথিভুক্ত কলরেতোদের অধিকার স্থিতি করা যায় না। এ অভিজ্ঞতা আজ দেশব্যাপী। অনেক খাস জমি প্রাপক দারিদ্রের জ্বালায় ও প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে জমি চাষ কলরতে পারেন নি। তাৎক্ষণিক ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য তাই পাট্টা জমি বিক্রয় করতে হয়েছে অথবা ঋণের দায়ে সেই জমি জোতদার বা মহাজনের কাছে চলে গেছে। সুতরাং বলা যায় ১৯৭৮ সাল থেকে ভূমি সংস্কারের প্রকৃত পথ নির্দেশিত ও অনুসৃত হতে শুরু হয়।

সারা ভারতে ভূমি সংস্কারের অবস্থা যখন খুবই বেগতিক পশ্চিমবঙ্গে তখন এই কাজ সমস্ত বাধা ঠেলে খাকিটা সফলতার পথে যেতে পেরেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী জমির ঊর্দ্ধসীমা আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সারা ভারতে ২১০ লক্ষ একর জমি সরকারের হওয়ার কথা তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৪১ লক্ষ একর সরকারের খাতায় এসেছে এবং তার মধ্যে ১৩ লক্ষ একর পশ্চিমবঙ্গের মত ছোটরাজ্যের। বিলিবন্টনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ অনেকখানি অগ্রসর। বর্গানথিভুক্তি ব্যাপারে যেখানে অন্যান্যরাজ্য বর্গাদারের অস্তিত্বই স্বীকার করে না পশ্চিমবঙ্গ শুধু তাদের স্বীকার করেছে তাই নয়, আইন প্রনয়ণ করে প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক সাহায্যে তাদের গ্রামীণ স্বত্বলিপিতে নথিভুক্ত করেছে। এ যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছে।

বর্গানথিভুক্তিতে যে নতুন স্কীম নেওয়া হয় তাকে 'অপারেশন বর্গা' নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে বলেন 'অপারেশন বর্গা' নামে হৈ চৈ না করে জরীপ বিভাগের স্বাভাবিক কাজের সময় বর্গাদারদের নথিভুক্ত করা ভালো ছিল। তাঁরা আরো বলেন–অহেতুক হৈ চৈ-এর জন্য বিষয়টিতে রাজনৈতিক গন্ধ এসে গেছে এবং প্রশাসনের সময় ও শক্তির অপব্যয় হয়েছে। কিন্তু যাঁরা গ্রামে কাজ করেন তাঁরা জানেন জোতদার মালিকের ব্যূহ ভেদ করে জরীপ বিভাগের সাধারণ কাজের সময় উপস্থিত হয়ে নাম নথিভুক্ত করা বর্গাদারদের পক্ষে কত কঠিন। স্বাভাবিক ভয় ছাড়া বগাদারদের মধ্যে নানা সংস্কার ও সংকোচ কাজ করে। এই সমস্ত ভেঙে তাকে সাহসী করার জন্য প্রয়োজন বর্গাদারকে যথাযথভাবে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা ও সংগঠনের মধ্যে এনে সাহসী করে তোলা। অপারেশন বর্গার পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্গা নথিভুক্তির প্রাক্কালে সান্ধ্যবৈঠক করা হয় যেখানে সরকারি কর্মচারী, পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দ ও কৃষক সংগঠন সমূহের দায়িত্বশীল কর্মীরা সমবেত ভাবে বর্গাদারাকে সাহস প্রদান করে ও তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। অতীতে দেখা গেছে যে বর্গাদার নথিভুক্ত হলেও সে তার অধিকার বজায় রাখতে পারে নি। যে সাংগঠনিক শক্তি ভূস্বামীর সংগে মোকাবিলা করতে একান্ত প্রয়োজন বর্গাদারদের পিছনে সেই সাংগঠনিক শক্তি ছিল না। কিন্তু এবার তারা নিজেরা অনেকখানি সংগঠিত এবং সামগ্রিকভাবে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত। দ্বিতীয়তঃ আইনের ভিতও অনেক শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক স্থাপিত টাস্ক ফোর্স পর্যন্ত সবাই কৃষকদের উন্নতির সোপান হিসাবে শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা তাঁদের ১৪১ নং কনভেনশজনে একই কথা বলেন এবং উন্নতিকামী এশীয় দেশ সমূহকে কৃষক সংগঠন জোরদার করতে আহ্বান জানান। নথিভুক্তির ব্যাপারে সংগঠনের ভূমিকা অভূতপূর্ব সাফল্যের দাবি রাখে। রাজস্ব আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু তাঁদের সর্বপ্রকার আন্তরিক প্রচেষ্ঠা উপযুক্ত সাফল্য লাভ করতে পারতো না যদি না কৃষক সংগঠন সমূহ এবং পঞ্চায়েত সততার সাথে এগিয়ে আসতো। অপারেশন বর্গার সাফল্য যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে

শেষাংশ ৪২১ পৃষ্ঠায়

জরিপ প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকার গত একশত বছরের জমি জরিপ ও প্রজাস্বত্ব প্রণয়ণ করার মত বিভাগীয় কাজ ছাড়া অন্যান্য যে সব কাজের সংগে যুক্ত আছে তার মধ্যে অন্যতম হল জরিপ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এদেশে ব্রিটিশরা আধুনিক পদ্ধতিতে জমি জরিপের প্রবর্তন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আধুনিক জরিপের প্রথম পরিকৃৎ জেমস রেনেল্ট। তিনি ছিলেন প্রথমে বঙ্গ প্রদেশের ও পরে সারা ভারতের প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল। ভারতবর্ষে ১৭৬৪ খৃঃ থেকে ১৭৭৭ খৃঃ পর্যন্ত তাঁর অবস্থান কালে, বিভিন্ন জরিপ কার্যের মধ্যে পূর্বভারতের নদী পথগুলির জরিপ ও মানচিত্র প্রস্তুত করাই ছিল তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই জরিপ তাঁকে একাই করতে হয়েছিল দেশী কুলী কামিনদের সাহায্যে। এরপর ১৮২২ সালের বঙ্গীয় রাজস্ব নিষ্পত্তি রেগুলেশনের ৬নং ধারা অনুযায়ী প্রথমে "থাক সার্ভে এবং পরে রেভেনিউ সার্ভে" বা রাজস্ব জরিপ সম্পাদিত হয় ১৮৪০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে। ব্রিটিশ সামরিক ইঞ্জিনিয়াররা স্থানীয় জরিপ সহায়ক বা আমিনদের সাহায্যে এই জরিপের কাজ পরিচালনা করেন। অবশ্য এই আমিনেরা আধুনিক জরিপ বিদ্যায় তেমন পারদর্শী না হওয়ায় তাঁরা শুধু রাজস্ব পরিমাপকদের (বা রেভেনিউ সার্ভেয়ার) সহায়ক মাত্রই ছিলেন। রাজস্ব জরিপ শুধুমাত্র ৪" সমান ১ মাইল স্কেলে এবং মহাল বা এস্টেট্ অনুযায়ী হয়েছিল বলে সেরকম ব্যাপক বা বিস্তারিত ধরণের ছিল না। সেজন্য অল্প সংখ্যাক জরিপ সহায়কদের সাহায্যে রাজস্ব পরিমাপকরা এই কাজ সম্পন্ন করে উঠতে পেরেছিলেন।

এরপর ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী বঙ্গ প্রদেশে প্রত্যেকটি মৌজা নূন্যতম ১৬ ইঞ্চি সমান ১ মাইল স্কেলে এবং ঘনবসতি পূর্ণ জায়গাগুলি আরও বড় স্কেলে অর্থাৎ ৩২" ইঞ্চি সমাণ ১ মাইল থেকে ১২৮" ইঞ্চি সমান ১ মাইল স্কেলে জরিপ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই কাজ শুরু হয় ১৮৮৮ সাল থেকে যা "ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট" নামে খ্যাত। এই বিরাট কাজের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর সংখ্যাক আধুনিক জরিপ জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীর। এইভাবে পরিমাপক বা আমিণের কাজ এদেশে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

জরিপ-জ্ঞান-সম্পন্ন কর্মীর চাহিদার ফলে প্রয়োজন হয় জরিপ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার। ১৮৮৪ সালে ভূমিলেখ্য অধিকর্তার পদের সৃষ্টির অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সৃষ্টি হয় জরিপ শিক্ষা উপদেষ্টা মন্ডলীর (সার্ভে এডুকেশন অ্যাডভাইসারি বোর্ড)। এই মন্ডলীর সভাপতি হন পদাধিকার বলে ভূমিলেখ্য অধিকর্তা। এই মন্ডলীর বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম কাজ হল জরিপ শিক্ষার বিভিন্ন পাঠক্রম নির্দিষ্ট করা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ণ উত্তরপত্রের মূল্যায়ণ, এবং পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট প্রদান।

আধুনিক জরিপ-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এগুলি হল রংপুরে বেহাল-গোবিন্দলাল টেক্‌নিক্যাল স্কুল, পাবনাতে এলিয়ট-বনমালী টেক্‌নিক্যাল স্কুল, বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ড টেকনিক্যাল স্কুল এবং রাজশাহীতে ডায়মন্ড জুবিলী ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল।

বেহাল-গোবিন্দলাল স্কুল ১৮৮৯ সালে স্থাপিত হয় রংপুরে। এই স্কুল সরকার এবং তাজহাটের মহারাজা গোবিন্দলাল রায়ের আর্থিক অনুকূল্যে পাবনা ডিস্ট্রিক্ট সরকারি পরিচালনাধীনে আসে।

১৮৯১ সালে এলিয়ট-বনমালী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলার তখনকার লেঃ গভর্নরের পাবনা সফর উপলক্ষে। এই স্কুলটি ১৯২২ সাল পর্যন্ত পাবনা ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের অধীনে থাকার পর সরকারি পরিচালনাধীনে আসে।

বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড টেকনিক্যাল স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে। এটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালিত এবং বাৎসরিক সরকারি অনুদান পুষ্ট ছিল।

ইংলন্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৮৯৮ সালে স্থাপিত হয় রাজশাহীর ডায়মন্ড জুবিলি ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল। এটিও রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পরিচালনাধীন ছিল।

এইসব স্কুলগুলিতে এক বছরের জরিপ প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রচলিত ছিল। এই পাঠক্রম সম্পূর্ণ করার পর শিক্ষার্থিরা জরিপ শিক্ষা উপদেষ্টা মন্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত 'আমিনশিপ সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ চলাকালীন আবাসিক হিসাবে স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসে অবস্থান করতে হতো। মেধাবী ছাত্রাদের জন্য বৃত্তির এবং গরীব ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে পড়াশুনোর ব্যবস্থা ছিল।

এছাড়াও তদানীন্তন বঙ্গপ্রদেশের আরও দুটি জায়গায় জরিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তার একটি হল ঢাকায় আসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং-স্কুল এবং অপরটি ছিল বরিশালের চন্দ্রদ্বীপে। তবে এ দুটি প্রতিষ্ঠানে জরিপ প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পরে শুরু হয়।

পুরাতন জরিপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২ জানুয়ারি, অধুনা বাংলাদেশের ময়নামতীতে। ইংরাজ প্রাদেশিক সরকারের শিল্প অধিকর্তার (ডিরেক্টর অব্ ইনডাস্ট্রিজ) প্রশাসনাধীনে বারো সদস্যের এক কমিটি এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। কুমিল্লা রেল স্টেশন থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একজন অধ্যক্ষ, একজন অধ্যাপক, দুজন সহ-অধ্যাপক, একজন প্রদর্শক, কয়েকজন করনিক ও একজন চিকিৎসককে নিয়ে এই স্কুল শুরু হয়। তিনটি পাঠক্রমে এখানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হতো-(১). 'আমিনশিপ' সার্টিফিকেটের জন্য এক বৎসরের পাঠক্রম, (২) 'সার্ভে ফাইন্যাল' সার্টিফিকেটের জন্য দুই বৎসরের পাঠক্রম এবং (৩) সরকারি বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম।

প্রথম বর্ষের (অর্থাৎ আমিনশিপ পাঠক্রমের) ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫০ এবং দ্বিতীয় বর্ষে ছিল ৩০। প্রথমবর্ষের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে থেকেই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের নির্বাচন করা হতো। প্রথম বর্ষের সেশন শুরু হতো পয়লা আগস্ট এবং শেষ হতো পরের বছরের ৩১ জুলাই। দ্বিতীয় বর্ষের সেশন্ শুরু হতো পয়লা নভেম্বর।

প্রথমবর্ষে ভর্তির জন্য শিক্ষাগত মান হিসাবে প্রয়োজনীয় ছিল

ম্যাট্রিকুলেশান সার্টিফিকেট অথবা ন্যূনপক্ষে পাটিগণিত এবং সহজ ইংরাজী সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান। দ্বিতীয় বর্ষে ভর্ত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল আমিনশিপ্ সার্টিফিকেট এবং নূন্যপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ম্যাট্রিকুলেশান সার্টিফিকেট।

ময়নামতী জরিপ স্কুলেও ছাত্রদের আবাসিক হিসাবে অবস্থান করতে হতো। পুরাতন নথি থেকে দেখা যায় যে ১৯২৯ সালে একটি আবাসিক ছাত্রের এক মাসের থাকা খাওয়ার খরচ ছিল মাত্র ১১, (এগার) টাকা।

প্রথমবর্ষে, মেধাবী ছাত্রদের জন্য প্রতিটি মাসিক ১০, (দশ) টাকা করে চারটি বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। একই-সংখ্যক বৃত্তি দ্বিতীয় বর্ষেও দেওয়া হতো।

ভূমি-জরিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও ময়নামতীতে একটি ছয় মাসের খনি জরিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। সার্ভে ফাইনাল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম আটজনকে এই কোর্সের জন্য নির্ব্বাচন করা হতো।

১৯৩৫ সালে এই স্কুলের নাম-'বেঙ্গল সার্ভে-স্কুল, ময়নামতী' পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়-'বেঙ্গল সার্ভে স্কুল, কুমিল্লা।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জরুরি অবস্থার জন্য এই সার্ভে স্কুলটিকে ময়নামতী থেকে সরিয়ে বাঁকুড়ায় আনা হয় এবং মহাযুদ্ধ শেষ হলে সার্ভে স্কুলটি আবার ময়নামতীতে ফিরে যায়।

দেশ স্বাধীন হবার আগেই সরকারি মহলে অনুভূত হয় যে পূর্ববঙ্গের মত পশ্চিমবঙ্গেও এরূপ একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে। সেই অনুসারে প্রয়োজনীয় স্থাণ নির্ব্বাচনের কাজ শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকেই হুগলী জেলার ব্যান্ডেলে একটি পরিত্যক্ত সামরিক শিবিরকে নতুন সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্থান বলে নির্ব্বাচিত করা হয়। ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ এর-- প্রশাসনাধীনে ব্যান্ডেলের-"সার্ভে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট্' শুরু হয়। তখন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য-শিক্ষক ও করনিকগণ সকলেই ছিলেন ময়নামতী স্কুল থেকেই আগত। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় এঁরা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের 'ব্যান্ডেল সার্ভে স্কুলে' চলে আসেন।

ব্যান্ডেল জরিপ বিষয়ক শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষাগত মান প্রায় একই রাখা হয়. শুধু সার্টিফিকেটের নামের পরিবর্ত্তন করা হয়। 'আমিনশিপ' সার্টিফিকেটের নাম পরিবর্ত্তন করে রাখা হয়-"জুনিয়ার সার্ভেয়ারস্ সার্টিফিকেট" এবং 'সার্ভে ফাইনাল সার্টিফিকেটের নাম রাখা হয়-"সিনিয়র সার্ভেয়ারস্ সার্টিফিকেট।"

প্রথমদিকে পরিত্যক্ত সামরিক শিবিরটিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাশ ও আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শিবিরটিতে কয়েকটি ভাঙাচোরা কাঠের ছাউনি এবং ভগ্ন প্রায় ইঁটের ঘর ছিল। এই গুলিকেই কোনভাবে সংস্কার করে প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রথমে শুরু করা হয়। এর পরে বর্ত্তমানের জরিপ প্রশিক্ষণ ভবনটি তৈরি করা হয় ১৯৫১-৫২ সালে।

এখন এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্বয়ং সম্পূর্ণ। এখানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়াও ছাত্রদের আবাসন, খেলাধূলার জন্য বড় মাঠ, এবং অধ্যক্ষ ও চিকিৎসক সহ সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের জন্যে আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্ত্তমানে জুনিয়র এবং সিনিয়র উভয় পাঠ্যক্রমের আসন সংখ্যা-৭০। প্রশিক্ষণের মান যথেষ্টই উচ্চ পর্যায়ের এবং পরীক্ষায় সাফল্যের সংখ্যাও খুবই ভাল। সফল পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দপ্তরের নানা প্রকল্পে এবং বেসরকারি সংস্থাতেও কর্ম-সংস্থানের সুযোগ পান। এখন প্রথমবর্ষের ৭০টি আসনের জন্য প্রায় এক হাজারের ও বেশি প্রার্থী প্রতিযোগিতা মূলক ভর্ত্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এর থেকে জরিপ প্রশিক্ষণের বর্ত্তমান জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

জরিপ শিক্ষা উপদেষ্টা মন্ডলী এখন 'সার্টিফিকেট পাঠক্রমকে' 'ডিপ্লোমা পাঠক্রমে' রূপান্তরিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। যদি তা বাস্তবে রূপান্তরিত হয় তা'হলে জরিপ প্রশিক্ষণের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেটা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে পরিগনিত হবে।

বাংলার ভূমিসংস্কার ও তার প্রেক্ষাপট

(৪১৯ পৃষ্ঠার পর)

আঘাত হানতে পেরেছে তার বড় প্রমান অন্য কোন কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে এতখানি বিতর্কের ঝড় ওঠে নি। অনেকে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন যে বিধবার জমিতেও বর্গা রেকর্ড হচ্ছে এ কোন দেশি বিচার এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে তাঁরা এত বেশী সরগরম যেন মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সব জমির মালিক বিধবা। কিন্তু বিধবারা যদি চাষে বর্গানিযুক্ত করতে পারেন তবে তা নথিভুক্ত হবে না কেন ? যাইহোক, এই বিশাল কর্মকান্ডে সামান্য ভুল ত্রুটিও হতে পারে কিন্তু তাই বলে এক বিশাল সংখ্যক অসহায় কৃষককে সামান্য সুরক্ষা দান করা হবে না এতো হতে পারে না। নথিভুক্ত বর্গাদাররা নিজেদের উৎপাদনের প্রধান উৎস অর্থাৎ ভূমির উপর অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ায় এবং সরকারি সংস্থা ব্যাংক ও সমবায় থেকে অত্যল্প সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে। Socio-economic Research Institute, calcutta ইতিমধ্যে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে নথিভুক্তির পর বর্গাদারেরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

অপরদিকে ১৩ লক্ষ একর সরকারে বর্তানো জমির মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ একর জমি ১২ লক্ষ ক্ষেতমজুর, বর্গাদার ও অত্যান্ত স্বল্প জমির কৃষকদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে। আইন করা হয়েছে যাতে পাট্টা প্রাপকরা তাদের জমি বিক্রয় করতে না পারে। বিক্রয় যাতে না করতে হয় এই জন্যে ব্যাংকের ঋণ, মিনিকিট, আই.আর. ডিপি প্রকল্প নিয়ে তাদের অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এন.আর.ই.পি ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে যাতে বেশ কিছুদিন কর্মসংস্থান হয় সে দিকে নজর রাখা হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে এতসব সত্ত্বেও বর্গাদার ও পাট্টাপ্রাপকদের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। তবে এরা সবাই ক্ষেতমজুর এবং সামান্য সংস্থান থাকলে মজুরী-বৃদ্ধির-লড়াইয়ের ক্ষমতা খানিকটা বৃদ্ধি পাবে। ভারতের ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারদের মধ্যে এই ধারণা পরিষ্কার যে তারাই একদিন জমির মালিক ছিল সুতরাং জমি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। সামান্য খাসজমি পেয়ে বা বর্গাহিসাবে নথিভুক্ত হয়ে তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব ছন্নছাড়া জীবন থেকে কৃষকের জীবনে উত্তীর্ণ হবে এবং তার চিন্তা চেতনায় গুণগত পরিবর্তন ঘটবে। সে বুঝতে পারবে যে বর্তমান অবস্থায় যাবতীয় রাজনৈতিক ইচ্ছা ও প্রশাসনিক-আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তার অবস্থার খুব বেশী পরিবর্তন সম্ভব নয়। কৃষি কার্যের মাধ্যমে সে বাজারের সম্মুখীন হবে এবং সেই বাজারে তার পরিশ্রম গত ফসলের দাম ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের দাম তার বঞ্চনার কারণকে অনেকখানি তুলে ধরবে। সুতরাং বর্তমানে অনুসৃত ভূমি সংস্কার নীতি একদিকে তার চেতনার বিকাশ ঘটাবে অপর দিকে তাকে সংগঠিত হ'তে শেখাবে যার যুগ্ম ফলে সে সমসার সমাধানোর সূত্র খোঁজায় প্রয়াসী হতে পারবে।

ভারতের অর্থ কমিশন ও রাজ্য অর্থনীতি

মুরারি ঘোষ

৪

অর্থকমিশনের বন্টন ব্যবস্থা

প্রতিটি কমিশন বসানোর সময় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষথেকে কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি বলে দেওয়া হয়।

প্রথম কমিশনের সময় কেবল সংবিধান নির্দেশিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় কমিশনে রাজ্যগুলির ঋণ সম্পর্কিত সমস্যার বিষয়ে ভাবতে বলা হয়েছিল। এইকালে কমিশনের একটি বাড়তি কাজও এসে গেল। কাজটি কেন্দ্রের নতুন এক রাজস্ব ব্যবস্থা। বাড়তি আবগারী কর সম্পর্কিত। তামাক, বস্ত্র, চিনি–এই পণ্যগুলি রাজ্যের বিক্রয়করের এক্তিয়ার থেকে তুলে নিয়ে ১৯৫৭ সালে সংবিধান সংশোধন করে কেন্দ্রের অধিকারে বাড়তি আবগারী করের আওতায় নিয়ে আসা হল। এই পণ্যগুলির ওপর সাংবিধানিকভাবে কর বসাবার অধিকার রাজ্যগুলির রইলো না–রইলো কেন্দ্রের। কেন্দ্র এই পণ্যগুলির উৎপাদন থেকে রাজস্ব তুলে রাজ্যগুলিকে ভাগ করে দেবে। এই ভাগাভাগির নীতি ও পদ্ধতি অর্থ কমিশনের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কমিশনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন হল রেলযাত্রী ভাড়ার ওপর সংগৃহীত করের একটা বিশেষ পরিমাণ রাজ্যগুলিকে বন্টনের ব্যবস্থা নেওয়া।

তৃতীয় অর্থকমিশনের বিবেচ্য দ্বিতীয় কমিশনের অনুরূপ ছিল।

চতুর্থ কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে নতুন উপাদান ছিল আবগারী কর আর বিক্রয়করের প্রভাব কীভাবে পণ্যোৎপাদন ও পণ্যের ওপর পড়ে তা খতিয়ে দেখা। রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধিত ঋণের দায় মেটানোর জন্য কোনো বিশেষ অর্থভান্ডার সৃষ্টি করা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখা।

পঞ্চম কমিশনের বিচার্য বিষয়ের পরিধি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন বিষয়ের মধ্যে ছিল রাজ্যগুলির ওভার ড্রাফ্‌ট নেওয়ার সমস্যা–বাড়তি আবগারী করে আওতায় অন্যান্য পণ্যের অন্তর্ভুক্তি সম্ভাবনা। সরকারের রাজস্ব ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থাকে সুপরিচালিত করার জন্য কমিশনের মতামতও চাওয়া হয়েছিল।

ষষ্ঠ কমিশনের বিচার্য বিষয়ের উপাদানও কম ছিল না। কমিশন নির্দেশিত দানের বহর স্থির করার আগে রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত যোজনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আর্থিক সাহায্য খতিয়ে দেখার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থ কমিশন ছাড়াও যোজনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক থেকে রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত সম্পদের মোট হিসাব নিয়ে কমিশনের বন্টন ব্যবস্থা স্থির করার প্রসঙ্গও আনা হয়। এই সঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাত রাজ্যের সংগঠিত মূলধনী পরিসম্পৎ এবং ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত যোজনা ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নিতে বলা হয় কমিশনকে। আর একটি নতুন বিচার্য বিষয় ছিল–অনুন্নত রাজ্যগুলির উন্নয়ন প্রসঙ্গ।

সপ্তম কমিশনের বিচার্য বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল, রাজ্য পরিকল্পনাগুলিতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রচলিত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা।

বর্তমানে মোট ১৫ রকমের কর বা রাজস্ব তোলে কেন্দ্রীয় সরকার। এরই মধ্যে সংবিধানে নির্দেশিত ব্যবস্থায় রাজ্যগুলি যে সব রাজস্বের ভাগ পায় সেগুলি হল আয়কর, সম্পত্তি কর, বাড়তি আবগারী কর, কেন্দ্রীয় আবগারী কর, হোটেল কর। বাকী থাকে দশ রকমের কর বা রাজস্বের আয়। সবটাই পায় কেন্দ্রীয় সরকার। এই সব কর বা রাজস্ব ছাড়াও কেন্দ্রের বার্ষিক আয়ের বড় অংশ আসে রেলওয়ে, ডাক, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফজাত মাশুল থেকে এবং রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত ঋণজাত সুদ থেকে।

রাজস্ব বিভাজন ব্যবস্থা

সংবিধানে নির্দিষ্ট বিভাজ্য রাজ্যগুলির অংশ ভাগ কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হয়–বাকী অংশ রাজ্যগুলিকে ভাগ করে দেওয়া হয়। রাজস্ব বিভাজনের তিনটি পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম, রাজ্যের জনসংখ্যা অনুযায়ী, অর্থাৎ সারা ভারতের জনসংখ্যার মাথাপিছু সমান ভাগ বাঁটোয়ারা।

দ্বিতীয়, রাজ্য থেকে সংগৃহীত বিশেষ রাজস্বটির সংগ্রহের পরিমাণের নির্দিষ্ট ভাগ রাজ্যকে দেয়।

তৃতীয়, অনুন্নত রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার নির্ধারণ।

আয়কর

বিভাজ্য আয়করের একটা অংশ কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট রেখে বাকী অংশ বন্টন করার জন্য নীতি হিসাবে জনসংখ্যানুপাত এবং আঞ্চলিক সংগ্রহের অংশ ভাগ স্থির করে বন্টন করা হয়। কেন্দ্রের ও রাজ্যের অংশভাগ কী হবে সেটি প্রতি কমিশনকেই নতুন করে ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

প্রথম অর্থকমিশনে রাজ্যগুলি থেকে তোলা আয়করের ৪৫ শতাংশ কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট রেখে ৫৫ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। রাজ্যের নির্দিষ্ট অংশটি দুটি হিসাব মত ভাগ করা হয়। রাজ্যের প্রাপ্য অংশের ৮০ ভাগ জনসংখ্যানুপাতে ভাগ করে দেওয়া হয়–বাকী ২০ শতাংশ সংগ্রহের ভিত্তিতে বন্টিত হয়। যেমন ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা সারা ভারতের ৭.৬৮ শতাংশ। সেই হিসাবে রাজ্যগুলির প্রাপ্য ৮০ শতাংশের ৭.৬৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ পাবে। আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে সারা ভারতের সংগ্রহের অংশ ভাগ, যে যাই হোক না কেন, বাকী ২০ শতাংশের সেই অংশ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ পাবে। আয়কর থেকে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ প্রতিটি কমিশনের হিসাবে বাড়ানো হয়েছে কিছু পরিমাণে। কিভাবে তা বন্টিত হয়েছে পরবর্তী সারণীতে বর্ণিত হল।

সারণী ৪.১। অর্থ কমিশনগুলির আয়কর বন্টন পদ্ধতি।

অর্থ কমিশন	রাজ্যের প্রাপ্য হিসাবে সমগ্র (%) আয়-করের অংশ	রাজ্যের প্রাপ্য অংশে জন-সংখ্যানুপাতের(%) ভাগভিত্তিতে	রাজ্যে সংগ্রহের ভিত্তিতে(%)
প্রথম	৫৫	৮০	২০
দ্বিতীয়	৬০	৯০	১০
তৃতীয়	৬৬২/৩	৮০	২০
চতুর্থ	৭৫	৮০	২০
পঞ্চম	৭৫	৯০	১০
ষষ্ঠ	৮০	৯০	১০
সপ্তম	৮৫	৯০	১০

উৎসঃ অর্থ কমিশনের রিপোর্ট সমূহ।

কেন্দ্রীয় আবগারী কর

প্রথম কমিশনের হিসাবে মাত্র তিনটি পণ্যের ওপর সংগৃহীত আবগারী করের অংশভাগ রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। পণ্যগুলি ছিল তামাক, দিয়াশালাই ও কৃষিজ পণ্যজাত শিল্পপণ্য। এই সব পণ্য থেকে সংগৃহীত আবগারী করের মাত্র ৪০ শতাংশ রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশে ৮টি পণ্যকে গ্রহণ করা হয়েছিল। ঐ সব পণ্য থেকে সংগৃহীত করের ভাগ রাজ্যগুলির জন্য এবারে ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হল। ঐ আটটি পণ্য ছিল তামাক, দিয়াশালাই, চিনি, কফি, চা কাগজ ইত্যাদি। তৃতীয় কমিশনের সময় থেকেই আবগারী করের ৮০ শতাংশ কেন্দ্রে নিজের জন্য নির্দিষ্ট রাখে। রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট থাকে ২০ শতাংশ। এই ব্যবস্থা ষষ্ঠ কমিশন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু পণ্যের উপর বিশেষ আবগারী কর ধার্য করতে থাকে–যার অংশ রাজ্যের প্রাপ্য নয়। এই ভাবে আবগারী কর থেকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ কমিয়ে রাখার একটি পদ্ধতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়ে গেল। তৃতীয় কমিশন থেকে আবগারী করের বন্টনযোগ্য কিছু অংশ রাজ্যগুলির অনুন্নয়নের ভিত্তিতে দেওয়া হতে থাকে। অনুন্নয়ন বিচারের তিন ধরনের পদ্ধতি তিনটি কমিশন স্থির করে দিয়েছিল।

প্রথম কমিশন বন্টনযোগ্য আবগারী করের সবটাই জনসংখ্যানুপাতে বন্টনের পক্ষে নির্দেশ দেয়।

দ্বিতীয় কমিশন ৯০ শতাংশ জনসংখ্যানুপাতে ও বাকী ১০ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যকার বৈষম্য দূর করার নামে এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা দেয়।

তৃতীয় কমিশন এই করের বন্টনযোগ্য সমগ্র অংশই আঞ্চলিক অনুন্নয়নের ভিত্তিতে বন্টিত হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল। তৃতীয় কমিশনে অনুন্নয়ন বিচারের পদ্ধতি ছিল রাজ্যের জনসংখ্যায় তফসিলভূক্ত সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের সংখ্যা বিচার।

পরের দুটি কমিশন রাজ্যের প্রাপ্যের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যানুপাতে রেখে ও বাকী অংশ অনুন্নয়ন বিচারে দেওয়ার কথা বলে। ষষ্ঠ কমিশন রাজ্যের প্রাপ্য আবগারী করের ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যানুপাতে রাখে। বাকী ২৫ শতাংশ রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্যের তুলনামূলক অবস্থান হিসাবে দেওয়া হবে বলে স্থির করে।

সপ্তম কমিশন অবশ্য কেন্দ্রীয় আবকারী করের ৪০ শতাংশ বন্টনযোগ্য বলে নির্দেশ দেয় এবং বিভাজনের নিয়মে রাজ্যের জনসংখ্যানুপাত, মাথাপিছু আয়ের তারতম্য, দরিদ্র জনসংখ্যানুপাত ও রাজস্বপ্রাপ্তির সমতা আনার নামে বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী দেবার ব্যবস্থা রাখে। সপ্তম কমিশনে উল্লিখিত চারটি পদ্ধতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই ২৫ শতাংশ হিসাবে বন্টনযোগ্য কেন্দ্রীয় আবগারী কর বন্টিত হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরবর্তী সারণীতে বিভিন্ন কমিশনের বিচারে কেন্দ্রীয় আবকারী করে বন্টন ব্যবস্থা দেখানো হলঃ

সারণী ৪.২–কেন্দ্রীয় আবগারী করের বন্টন ব্যবস্থা।

অর্থ কমিশন	রাজ্যের অংশভাগ (%)	জনসংখ্যানু-পাত (%)	রাজ্যের মাথাপিছু আয়(%)	সামাজিক আর্থিক অনুন্নয়ন (%)	অন্যান্য প্রক্রিয়া (%)
প্রথম	৪০	১০০	–	–	–
দ্বিতীয়	২৫	৯০	–	–	১০
তৃতীয়	২০	জনসংখ্যানুপাতের ওপর বেশি নজর দিয়ে অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ আনা হয়েছে			
চতুর্থ	২০	৮০	–	২০	–
পঞ্চম	২০	৮০	১৩.৩	৬.৭	–
ষষ্ঠ	২০	৭৫	–	২৫	–
সপ্তম	৪০	২৫	২৫	২৫	২৫

উৎসঃ সাতটি অর্থ কমিশনের রিপোর্ট সমূহ

বাড়তি আবগারী কর

দ্বিতীয় অর্থ কমিশন বসার সময়ে স্থির করা হয় যে রাজ্যের বিক্রয় করের এক্তিয়ার থেকে চিনি, তামাক ও সূতীবস্ত্র তুলে নেওয়া হবে। এই পণ্যগুলির ওর বসানো হবে কেন্দ্রীয় বাড়তি আবকারী কর। বাড়তি আবকারী করের আওতায় পণ্যগুলিকে নিয়ে এসে সংগৃহীত করের সবটাই রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। পরে ১৯৫৭ সালে সংবিধান সংশোধন করে রাজ্যের এক্তিয়ার থেকে পণ্যগুলির ওপর কর বসাবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কমিশনে রাজ্যগুলিতে ঐ পণ্য গুলির বিক্রয় কর সংগ্রহের সম্ভাব্য পরিমাণ কী হতে পারে তা অনুমান করে বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

পঞ্চম কমিশনে রাজ্যে পণ্যগুলির সম্ভাব্য বিক্রয়কর সংগ্রহের অনুপাত ও জনসংখ্যার মাপকাঠি দুটি বিচারের ধারা পাশাপাশি রেখে বন্টন ব্যবস্থা হয়।

ষষ্ঠ কমিশনে রাজ্যগুলির জন সংখ্যানুপাত পণ্যের উৎপাদন এবং রাজ্যের আয় অনুসারে বন্টনের নীতি গৃহীত হয়।

সপ্তম কমিশনের ব্যবস্থা ষষ্ঠ কমিশনের অনুরূপ ছিল।

সম্পত্তি কর

সংবিধানের ২৬৯ ধারায় কিছু কিছু রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। কিন্তু সংগৃহীত করের সবটাই রাজ্যগুলিতে বন্টন হবে। সংবিধানের এই ধারায় রাজ্যগুলির জন্য বন্টনযোগ্য হিসাবে বর্তমানে রাখা হয়েছে সম্পত্তিকর ও রেলের, যাত্রী ও পণ্য ভাড়ার ওপরে কর।

প্রথম কমিশনে সম্পত্তি করের, অংশটি আয়কর বন্টনের পদ্ধতি অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে বন্টিত হয়।

দ্বিতীয় কমিশনে সংগৃহীত করের ১ শতাংশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য রেখে বাকী অংশ সারাদেশের হিসাবে রাজ্যের মোট সম্পদ মূল্যের ভাগ্য অনুযায়ী বন্টিত হয়। এই পদ্ধতি তৃতীয় ও চতুর্থ কমিশনে অনুসৃত হয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম কমিশনে এই করের ২ শতাশ ভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির জন্য রাখা হয়েছিল বাকী অংশ দ্বিতীয় কমিশনের গৃহীত পদ্ধতি অনুযায়ী বন্টিত হয়।

ষষ্ঠ কমিশনের হিসাবে ২.৫ ভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য রেখে বাকী অংশের কিছুটা আগেকার মত রাজ্য সম্পদের অংশভাগ হিসাবে এবং কিছুটা রাজ্যের জনসংখ্যানুপাতের হিসাবে বন্টিত হয়।

সপ্তম কমিশনের হিসাবে এই করের রাজ্যভিত্তিক বিভাজন ষষ্ঠ কমিশনের অনুরূপ রাখা হয়।

রেলযাত্রী ভাড়া বাবদ কর ১৯৫৭ সাল থেকে রেলযাত্রীভাড়ার ওপর কর বসানো হতে থাকে। এটি সংবিধানের ২৬৯ ধারার অন্তর্গত কেন্দ্র সংগৃহীকর কিন্তু রাজ্যগুলির জন্য বন্টনযোগ্য। বিভিন্ন রাজ্যে আদায়ীকৃত এই করের সবটাই রাজ্যগুলিকে ভাগ করে দেওয়ার পরিবর্তে এই করের নামে একটি বিশেষ অংকের টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দ্বিতীয় কমিশন থেকেই বছরে ১২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা এই বাবদ বন্টন করা হবে বলে স্থির হয়। তৃতীয় কমিশন থেকে ষষ্ঠ কমিশন পর্যন্ত সময়ে টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয় বছরে ১৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার। এই খাতে দেয় সম্পদের পরিমাণ মঞ্জুর করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে কনভেনশন কমিটি। সপ্তম কমিশন ও পূর্বের প্রদত্ত সম্পদ (১৬.২৫) রাজ্যের শহরতলীর রেল ব্যবস্থাজাত আয়ের অনুপাতে দেয় বলে ঘোষণা করে।

পাট রপ্তানী কর

ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক ব্যবস্থার শেষদিন পর্যন্ত পাট রপ্তানী থেকে কর বাবদ আয়ের একটা অংশ বঙ্গদেশ, বিহার, ওড়িশা ও আসাম পেত। যেহেতু রপ্তানীযোগ্য পাটজাত দ্রব্য থেকে বিক্রয় কর তোলার অধিকার রাজ্যের হাতে দেওয়া হয়নি সেই হেতু এই বাবদে প্রাপ্য থেকে পাট উৎপাদক রাজ্যগুলি যাতে বঞ্চিত না হয় সেই কারণে এই ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়। নতুন সংবিধান গৃহীত হবার মাত্র ১০ বছর এই খাতে উপরোক্ত চারটি রাজ্যকে বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় কমিশনের সময় থেকে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অনুদান (গ্র্যান্টস-ইন-এইড)

প্রত্যেক কমিশন সংবিধানের ২৭৫(১) ধারায় কেন্দ্রের ভান্ডার থেকে রাজ্য সমূহের প্রাপ্য অনুদান সুপারিশ করে থাকে। সব রাজ্যগুলি কমিশনের বিচারে অনুদান পায়না। কোন রাজ্যগুলি পাবে এবং কত পরিমাণে পাবে কমিশন সেটি ঠিক করে দেয়। প্রথম কমিশন এ সম্পর্কে যে নীতি স্থির করেছিল সেইটি পরের কমিশনগুলি অনুসরণ করে আসছে।

অনুদান বিতরণের উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রপ্রদত্ত রাজস্ব ও করের ভাগ রাজ্য বাজেটের ফাঁক পূরণ করতে না পারলে অনুদানের ব্যবস্থা। আসন্ন ঘাটতি বাজেটের অনুমানও কমিশন গুলির হিসাবে তৈরি হয়। অনুদান সুপারিশের আরো কয়েকটি লক্ষ্য আছে। যেমন, রাজ্যগুলির সমাজকল্যাণমূলক কাজের সহায়তা একটি অন্যতম বিচার্য বিষয় এ ছাড়া রাজ্যের অনুন্নত আর্থিক অবস্থার কারণেই মূলত অনুদান বন্টনের ব্যবস্থা।

প্রথম কমিশনের বিচারে অনুন্নত আর্থিক অবস্থার কারণে নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি বিশেষ অনুদান লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান, ওড়িশা, পাঞ্জাব, মধ্যভারত ও পেপসু।

দ্বিতীয় কমিশনের বিচারে যে রাজ্যগুলি রাজস্বের ভাগ পেয়েও আর্থিক সংগতির নিচের দিকে থাকবে এবং সেই কারণে বিশেষ অনুদান পায় সেই রাজ্যগুলি হল, অন্ধ্র, আসাম, বিহার, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীর।

রাজস্বের ভাগ পেয়েও তৃতীয় কমিশনের বিচারে সকল বাজেটে ঘাটতি থাকবে বলে অনুমিত হয়েছিল। এই কমিশন স্থির করেছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রয়োজন ছাড়াও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সম্পদ চাহিদা মেটাতে রাজ্যগুলির বাড়তি অনুদান প্রয়োজন। এই ধারায় বিবেচনা করে কমিশন ১৫টি রাজ্যকেই বিশেষ সুপারিশ করে। রাজ্যগুলি হল অন্ধ্র, আসাম, বিহার, জম্মুকাশ্মীর গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। তৃতীয় কমিশন ছাড়া আর কখনোই বিশেষ অনুদান সুপারিশ করেনি।

চতুর্থ কমিশনের বিচারে রাজস্বের ভাগ পেয়েও মোট দশটি রাজ্যের বাড়তি সম্পদের প্রয়োজন দেখা দেবে বলে অনুমিত হয়। নিম্নলিখিত দশটি রাজ্যের কমিশন বিশেষ অনুদান সুপারিশ করেঃ অন্ধ্র, আসাম, জম্মুকাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা ও রাজস্থান।

পঞ্চম কমিশনের বিচারেও অনুদান পাবার যোগ্য হিসাবে দশটি রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। রাজ্যগুলির ব্যয়ের দিক বিবেচনা করে নির্দিষ্ট ভাবে ঘাটতি বাজেটের প্রসংগ পঞ্চম কমিশন প্রথম আনলেন। যে রাজ্যগুলি কমিশন প্রদত্ত রাজস্ব লাভ করেও বাজেট ঘাটতি এড়াতে পারবেন এবং সেই কারণেই বিশেষ অনুদান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল তারাহলঃ অন্ধ্র, আসাম, জম্মুকাশ্মির, কেরল মহীশূর, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ।

ষষ্ঠ কমিশনও অনুরূপ বিচারধারায় ঘাটতি রাজ্য গুলির জন্য বিশেষ অনুদান সুপারিশ করে। এই ঘাটতি রাজ্যগুলি হল, অন্ধ্র, আসাম, বিহার, হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীর, কেরল, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, রাজস্থান, ত্রিপুরা, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ।

পূর্বের কমিশনগুলির বিচারধারা অনুসরণ করে সপ্তম কমিশন যে রাজ্যগুলিকে ঘাটতি বাজেট রাজ্যরূপে চিহ্নিত করেন ও বিশেষ অনুদান পাবার যোগ্য বলে বিবেচনা করেন সেই রাজ্যগুলি হল, হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীর, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, সিকিম ও ত্রিপুরা।

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হল যে বিশেষ অনুদান পেয়েও রাজ্যগুলি ঘাটতি এড়াতে পারেনি পরবর্তী সারণীগুলিতে সেই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।১

পরবর্তী সারণী গুলিতে সাতটি কমিশনের রাজ্যভিত্তিক প্রদত্ত সম্পদ ও রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয়ের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সারণীগুলির বিশ্লেষণে আমাদের লক্ষ্যণীয় হল প্রধান দুটি বিষয়।

প্রথমঃ এ পর্যন্ত সাতটি কমিশনের সম্পদ বিভাজনের ফলে রাজ্যসমূহের বৈষয়িক উন্নতি বিশেষ কিছু ঘটেনি। দরিদ্র রাজ্যগুলি বৈষয়িক বিচারে দারিদ্র্য জয় করতে পারেনি—তুলনায় ধনী রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার বাড়তির পথে।

দ্বিতীয়ঃ দরিদ্র রাজ্যগুলি মাথাপিছু সম্পদ পেয়েছে কম অন্যান্য ধনী রাজ্যের তুলনায়।

সারণী ৪.৩। প্রথম কমিশনের বন্টিত সম্পদ ও রাজ্য বাজেটের ফলাফল

	কমিশন প্রদত্ত মোট সম্পদ (কোটি টাকায়)	রাজ্য বাজেটের কমিশন অনুমিত ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+)	প্রকৃত ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (কোটি টাকায়)
অন্ধ্র		হিসাব হয় নাই	−২৪.৫৩
আসাম		−১.০০	−২৬.০৩
বোম্বাই		−৩৮.৮০	−৩৮.৩৮
বিহার		−২.৪৮	−৬৪.০৩
হায়দ্রাবাদ		−১.২০	−১০.৭৮
জম্মু-কাশ্মীর		−	−৪.১৩
মধ্য ভারত		−০.৫৪	−৮.৭০
মধ্যপ্রদেশ		−১.৫০	−২৩.১৯
মাদ্রাজ		−	−৫২.৫২
মহীশূর		−০.৪০	−১৪.৮৩
ওড়িশা		−১.৭২	−২৯.১৪
পেপসু		−০.২৮	−৫.৪১
পাঞ্জাব		−২.০৯	−১৫.০৮
রাজস্থান		−১.১৯	১১.১১
সৌরাষ্ট্র		−০.৪০	−১৯.৩২
ত্রিবাংকুর কোচিন		−০.৪৫	−৬.৬৮
উত্তর প্রদেশ		−	−৩৮.৫২
পশ্চিমবঙ্গ		−০.৮০	−৭৪.৫২
মোট		−১৪.০৫	−৪৬৬.৩২

(১) সারণী ৪.৩ থেকে সারণী ৪.৯ দ্রষ্টব্য

সারণী ৪.৪—দ্বিতীয় কমিশনের বন্টিত সম্পদ, রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় ও বাজেটের ফলাফল

রাজ্য	১ মাথাপিছু আয় (১৯৬০–৬১) (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ মাথাপিছু (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ (মোট কোটি টাকায়)	রাজ্য বাজেটের ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত + (কোটি টাকায়)	প্রকৃত ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)
বিহার	২১৬	২৫.৮৩	৯৫.৩২	−৩.৮০	+১৬.৩৬
ওড়িশা	২২৬	৩১.৫০	৪৭.২৫	−৩.৩৫	−১৫.২৮
উত্তর প্রদেশ	২৪৪	২২.৪৯	১৪১.৬৯	−	+১২.৬২
জম্মু-কাশ্মীর	২৬৭	−	২৪.৫৭	−৩.০০	+১০.৫২
রাজস্থান	২৭১	৩২.০১	৪৮.০২	−২.৫০	−১০.৮৫
মধ্যপ্রদেশ	২৭৪	৩৪.০৭	৭১.৫৪	−১.৭৫	+১১.৭৩
কেরল	২৭৮	৪২.১২	৩৭.৯১	−১.৭৫	+১১.৭৩
মহীশূর	২৯১	৮১.৬২	৭৩.৪৬	−৬.০০	+১৯.৩২
অন্ধ্র	৩১৪	৪৭.৪০	৯০.০৫	+১৪.০৭	+১৮.০৭
তামিল নাড়ু	৩৪৪	১২.৭৯	৭২.৮৮	−	−৩.১৩
আসাম	৩৪৯	৫০.৪০	৪৫.৩৬	−৪.০৫	−০.২০
হরিয়ানা	৩৫৯	−	−	−	−
গুজরাট	৩৮০	২২.৩৭	৩৫.৭৯	−	−
পাঞ্জাব	৩৮৩	৩৯.৯৪	৫১.৯২	−২.২৫	+৪২.১৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩৮৬	৪১.৩৫	১০৩.৩৬	−৩.০০	+৭.১০
মহারাষ্ট্র	৪১৯	৩৪.৩৩	১০৯.৮৫	−	−৪.৮*

সারণী ৪.৫—তৃতীয় কমিশনের বন্টিত সম্পদ, রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় ও বাজেটের ফলাফল

রাজ্য	মাথাপিছু আয় (১৯৬২–৬৩) (টাকায়)	মোট প্রাপ্ত সম্পদ মাথাপিছু (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ (কোটি টাকায়)	কমিশনের অনুমিত রাজ্য বাজেটের ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)	প্রকৃত ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)
বিহার	২৩২	২১.৮৪	১০২.৬৩	−০.৭৫	+৪৬.০৪
উত্তর প্রদেশ	২৫৮	১৯.৯৯	১৪৭.৯৫	−	+২০.২৭
ওড়িশা	২৬১	৫৬.২২	১০১.২০	−	−২১.৫৯
জম্মু-কাশ্মীর	২৬৭	৫৪.৩৮	২১.৭৫	−২০০	+২১৮.০০
মধ্যপ্রদেশ	২৮০	২৬.৩০	৮৬.৮১	−৩.০০	+৫.০৭
রাজস্থান	২৮৯	৩০.৫৩	৭০.২১	−৫.২৫	−৬.৮৮
কেরল	৩০৩	৪০.২৬	৬৮.৪৫	−৬.২৫	−৭.৩০
মহীশূর (কর্ণাটক)	৩২৭	৩৩.৮৫	৮১.২৩	−১৩.২৫	−৬.৬৭
অন্ধ্র	৩৩৮	৩৩.৯২	১১২.১২	−৯.৫০	+১১.৮৫
আসাম	৩৪৯	৪৮.৮১	৫৮.৫৭	−৬.০০	−২৬.০৫
তামিল নাড়ু	৩৬৫	২৬.৯৯	৯১.৭৫	−৩.০০	−৯.৩৫
হরিয়ানা	৩৮১	−	−	−	−
গুজরাট	৪১৩	৪০.৫৬	৮৫.১৮	−৫.২৫	−
পশ্চিমবঙ্গ	৪২০	২৬.৭৮	৯৩.৭২	−	+১০.৮৫
পাঞ্জাব	৪২১	৫৩.৬৩	৫৮.৯৯	−	+৪৯.৮৩
মহারাষ্ট্র	৪২৯	৩০.৬৫	১১৯.৫২	−৬.৭৫	+৭.২৫

(১) পঞ্চম কমিশনের রিপোর্ট থেকে সংকলিত

সারণী ৪.৬–চতুর্থ কমিশনের বণ্টিত সম্পদ, রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় ও বাজেটের ফলাফল

রাজ্য	১ মাথাপিছু আয় (১৯৬৪–৬৫)	প্রাপ্ত সম্পদ মাথাপিছু (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ (মোট কোটি টাকায়)	রাজ্য বাজেটের ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)	প্রকৃত ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)
বিহার	২৯৯	২৩.৮৫	১২১.৬১	+৮৯.২৫	–২২.৮২
জম্মু-কাশ্মীর	৩৪১	৭৯.১৫	৩৯.৬৬	–৩২.৮৫	+১৩.১১
ওড়িশা	৩৪৭	৭৩.৮১	১৪০.২৪	–১৪৫.৯০	–৬.৯৫
রাজস্থান	৩৫৬	৩৪.৩০	৭৮.৮৮	–৩৩.৬৫	–৬২.৫৬
মধ্যপ্রদেশ	৩৭৩	২৭.৩৩	৯৮.৩৯	–১৩.৫০	–১৮.২০
উত্তর প্রদেশ	৩৭৪	২৮.২৮	২২৬.২৩	+৭৯.০২	+৫০.৫২
কেরল	৩৯৩	৫৯.৮৩	১১৩.৬৭	–১০৪.১০	+১৮.৬৬
মহীশূর (কর্ণাটক)	৪২০	৫০.২২	১৩০.৫৬	–৯১.২০	–৬০.৪৫
তামিল নাড়ু	৪৩৪	৩৪.৭৫	১২৫.১০	–৩৪.২০	+১৪.৭৩
অন্ধ্র	৪৩৮	৩৬.০২	১৪০.৪৯	–৩৬.১০	–৯.৪৬
আসাম	৪৪১	৬৭.৬০	৮৭.৮৮	–৮২.৬০	–৪৩.৫৭
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯৮	৩০.৩৪	১১৮.৩৩	+১৩.৯৭	–৩১.৪৩
হরিয়ানা	৫০৪	৭৮.৬৩	৭০.৭৭	–	–
গুজরাট	৫২৩	৩২.০৭	৭৩.৭৭	+৮.০০	+১.৭৬
মহারাষ্ট্র	৫২৬	৩৫.৭৩	১৫৭.১৯	+২১৫.৬৬	–১৫.২৯
পাঞ্জাব	৫৭৫	৩২.৩১	৩৮.৭৭	+২৯.৮৩	+২২.৫৪

(১) পঞ্চম কমিশনের রিপোর্ট থেকে সংকলিত

সারণী ৪.৭–পঞ্চম কমিশনের বণ্টিত সম্পদ, রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় ও বাজেটের ফলাফল

রাজ্য	১ মাথাপিছু আয় (১৯৬৭–৭০) (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ মাথাপিছু (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ (মোট কোটি টাকায়)	কমিশন অনুমিত রাজ্য বাজেটের ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)	প্রকৃত ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)
বিহার	৩৮৯	৯০.২৮	৫০৮.৭৩	+১৯৯.৪৬	–৮৪.৩৭
মধ্যপ্রদেশ	৪৫৭	৮২.৩৭	৩৪৩.১০	+১৫.০৯	+১৫৫.২০
রাজস্থান	৪৭৪	১০২.৮৬	২৬৫.০৫	–৫১.৪৯	–১৭৪.০৮
উত্তর প্রদেশ	৪৮২	৮৭.৪৪	৭৭২.৪৭	+২৮০.৮৭	+১৫৯.১০
জম্মু-কাশ্মীর	–	২৪.১৩	১১৫.৩৪	–৭৩.৬৮	–৪০.৩৫
অন্ধ্র	৫২৮	৯৪.৮৮	৪১২.৭৯	–৬৫.০১	+২৩.৫৮
কর্ণাটক	৫৪১	৮৪.৪০	২৪৭.২৮	–১৭.৯৯	+৯.২৬
আসাম	৫৪৩	১৩২.৭১	১৯৪.০৯	–১০১.৯৭	–১০৩.৫৯
ওড়িশা	৫৫০	১৩০.৯৫	২৮৭.৩৭	–১০৪.৬৭	–৯০.২১
কেরল	৫৮৩	১০৯.০৫	২৩২.৭৮	–৪৯.৬৫	–৬১.২৬
তামিলনাড়ু	৫৯১	৯০.০০	৩৭০.৭৮	–২২.৮২	–১৩.০১
পশ্চিমবঙ্গ	৬৩০	১০১.৩১	৪৪৮.৯২	--৭২+৬২	–৯১.৪৫
গুজরাট	৬৭১	৮৬.৪৬	২৩০.৮২	+১৫৮.৯৯	–২৮.৯৯
মহারাষ্ট্র	৬৭৭	৯৬.৫৭	৪৮৬.৮২	+৪১৯.২৯	–১৫৭.৬৯
হরিয়ানা	৮৩৬	৭৪.৯৯	৭৫.২৭	+৭৯.৮৮	+৬১.৯৬
পাঞ্জাব	৯৫৩	৮৩.৫১	১১৩.১৭	+১১৭.২২	+১০৬.৭৪
হিমাচল প্রদেশ			৫০.২২		

(১) ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের রিপোর্ট থেকে সংকলিত

সারণী ৪.৮–ষষ্ঠ কমিশনের বন্টিত সম্পদ, রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় ও বাজেটের ফলাফল

রাজ্য	১ ম'থাপিছু আয় (১৯৬০–৬১) (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ মাথাপিছু (টাকায়)	প্রাপ্ত সম্পদ (মোট কোটি টাকায়)	কমিশন অনুমিত রাজ্য বাজেটের ঘাটতি (–) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)	প্রকৃত ঘাটতি (—) বা উদ্বৃত্ত (+) (কোটি টাকায়)
বিহার	৪৮৯	১৪৯.৯০	৮৪৪.৭২	–১০৬.২৮	+৩৮৩.৫৬
ওড়িশা	৫১১	২৬৩.০৮	৫৭৭.৩২	–৩০৪.৭৩	+৮১০.৪৯
কর্ণাটক	৫৭০	১৩০.৯৪	৩৮৩.৬৪	+২৩২.৭৪	–৬৩.৬২
আসাম	৫৭২	৩০০.০৬	৪৩৯.৬২	–২৫৪.৫৩	+৫৪.৫৩
মধ্যপ্রদেশ	৫৭২	১৩০.৫০	৫৪৩.৫৭	+১১০.১৮	+৪৭২.৭৭
পশ্চিমবঙ্গ	৫৭৪	১৮৫.৭১	৮২২.৯৩	–২৩৪.৮৬	+১৩৮.২৪
রাজস্থান	৫৯০	২১৮.৮৬	৫৬৩.৯২	–২৩০.৫৩	+১৭.৬৯
জম্মু-কাশ্মীর	৬০২	৪৩.৫৮	২৩২.২৮	–১৭৩.৪৯	+২৮২.৩৬
অন্ধ্র	৬৩১	১৭৮.৩৮	৭৭৬.০০	–২০৫.৯৩	+৩৯৫.৫০
উত্তর প্রদেশ	৬৫২	১৫২.৭১	১৩৪৯.০৫	–১৯৮.৮৩	–৫২৭.৭১
কেরল	৬৫৬	২২৪.৮৪	৪৭৯.৯৭	–২০৮.৯৩	+৪৬১.২৫
তামিলনাড়ু	৭০২	১৩০.৩২	৫৩৮.৫৭	+১৮৪.৫৩	–৯১.৫২
হিমাচল প্রদেশ	৭২৭	–	২০৪.০৬	–১৬০.৯৬	–১০.০০
গুজরাট	৭৩৩	১৩৮.০৮	৩৬৮.৬৪	+৩৩৫.৪৬	+২৪৫.৯৫
মহারাষ্ট্র	৮৬৭	১৪১.১৪	৭১১.৫৩	+৭৪৮.৪২	+৬৫.৪০
হরিয়ানা	৯৮২	১২০.২২	১২০.৬৬	+২২৩.৩৫	+৮৫.৬১
পাঞ্জাব	১১০৫	১২৪.৬৯	১৬৮.৯৭	+৩৪১.৪৮	+১১২.৩১

(১) সপ্তম কমিশনের রিপোর্ট থেকে সংকলিত

সারণী ৪.৯–সপ্তম কমিশনের বন্টিত সম্পদ, রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় ও রাজ্য বাজেটের ফলাফল

রাজ্য	মাথাপিছু আয় (২৯৭৮) (টাকায়)	মাথাপিছু প্রাপ্ত সম্পদ (টাকায়)	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (কোটি টাকায়)
বিহার	৬৪৫	৩৯৩	২২১২.৮৭
উত্তরপ্রদেশ	৭১৫	৩৭৫	৩৩১৪.৭৪
মধ্যপ্রদেশ	৭৭৬	৩৮৩	১৫৯৭.৪৬
আসাম	৭৯১	৩৫৫	৫১৮.৬৫
ওড়িশা	৭৯৩	৪৪৯	৯৮৪.৪৫
জম্মু-কাশ্মীর	৮১১	৮১৬	৩৭৬.৮৯
রাজস্থান	৮৫৩	৩৫০	৯০২.৮১
অন্ধ্র	৯২৮	৩৪০	১৫২২.৪৯
তামিলনাড়ু	৯৪২	৩৬৫	২৫০৩.৬০
কেরল	৯৪৮	৩৬১	৭৭০.৩৪
পশ্চিমবঙ্গ	১০৩৩	৩৬০	১৫৯৭.১১
কর্ণাটক	১০৪৫	৩৪৩	১০০৫.০০
হিমাচল প্রদেশ	১০৬৮	৯৪০	৩২৫.০৭
গুজরাট	১১৩৪	৩৬১	৯৬৩.৮৭
মহারাষ্ট্র	১৩৪৯	৩৪০	১৭১৪.০৬
হরিয়ানা	১৩৯৯	৩০৭	৩০৮.৫৭
পাঞ্জাব	১৫৮৬	৩১০	৪১৯.৫৩

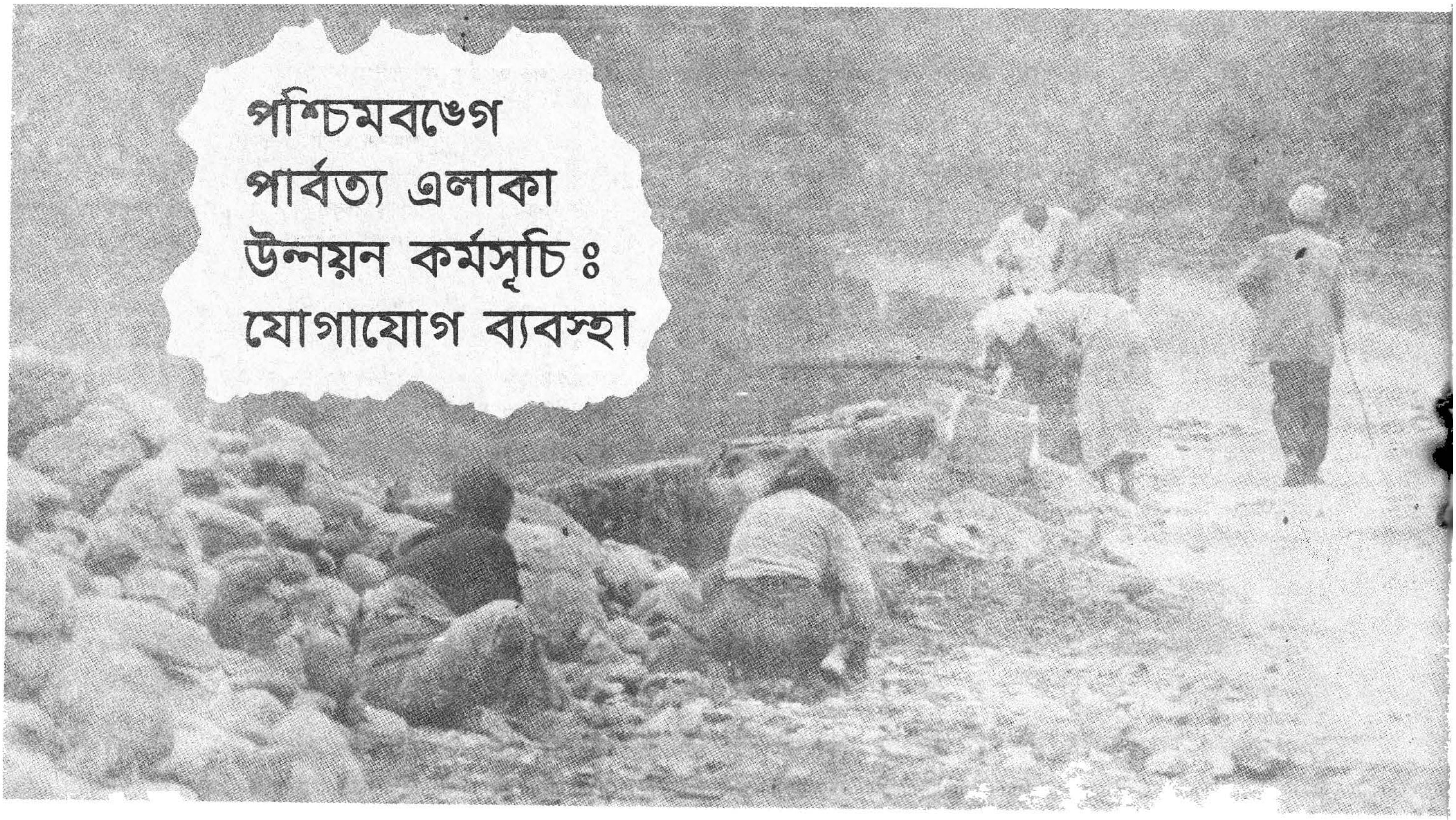
উৎসঃ সপ্তম কমিশনের রিপোর্ট থেকে

নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের জীবনাবসান

প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত গত ১১ নভেম্বর, ১৯৮৪, তারিখে ৭৮ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার বলেছেন–বিখ্যাত নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তর মৃত্যুতে বাংলার নাট্যজগতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ ঘটেছে। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্মানের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। বহু সংখ্যক মঞ্চ সফল নাটকের রচয়িতা এবং পরিচালক হিসেবে এদেশের নাট্যমোদী জনসাধারণ তাঁকে মনে রাখবেন। এ ছাড়া তিনি মঞ্চে অভিনেতারূপেও অবতরণ করেছেন। কিছুকাল তিনি যাত্রা জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাট্য পরিচালনা নিয়েও তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তাঁর মৃত্যুর ফলে বাংলার নাট্য জগতের একটি যুগের অবসান হল। তাঁর স্থান আর পূরণ হওয়ার নয়।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়াত নট ও নাট্যকারের আত্মীয়বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা



কার্শিয়াং রেল লাইনের পাশে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলছে

আলোকচিত্রঃ রতন দাশগুপ্ত

দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে সরেজমিনে কিছু তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহের জন্য আমরা যখন এ বছরের ছয়ই জুন দুপুর বেলায় দার্জিলিং শহরের নব নির্মিত সুপারমার্কেটের সামনে নামলাম, তখন প্রবল বর্ষণে শহরের জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং শহর পর্যন্ত ছোট ট্রেন বন্ধ। নানা স্থানে ধ্বস নেমে পাহাড়ী পথঘাট কোথাও একেবারে বন্ধ, আবার কোথাও দুর্গম হয়ে পড়েছে। এ বছর এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই পার্বত্য এলাকায় প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে, মে মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হল অবিরাম বর্ষণ। কাঞ্চনজঙ্ঘা কুয়াশায় ঢাকা, তার রূপোলি মহিমান্বিত রূপ সাদা মেঘ ও কুয়াশার আড়ালে। সূর্যের আলো দেহে লাগবার উপায় নেই। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পার্বত্য এলাকার বহু জায়গায় দশ দিন ধরে ঘুরেছি। ধ্বস নেমে যেখানে পথে পাথুরে মাটির পাহাড় জমেছে সেই সব এলাকা ছাড়া সর্বত্রই রাস্তাঘাট প্রায় অটুট দেখেছি। দু মাসের ওপর প্রবল বর্ষণেও রাস্তার চেহারা তেমনভাবে বিকৃত হয়নি। আবার লেবং, মংপু, লাভার্স মিট, মিরিকে যাবার পথ অক্ষত রয়েছে। যেখানে পিচ উঠে পাথর বেরিয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তা সারানো চলছে। পার্বত্য পথ খুব বিপদসংকুল, যানবাহন সহজেই দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। তাই সমতল ভূমির চেয়ে পাহাড়ী এলাকার রাস্তাঘাটের প্রতি বেশি দৃষ্টি দিতে হয়। দার্জিলিং-এর পার্বত্য বিষয়ক শাখা সচিবালয় এবারে প্রবল বর্ষণের মধ্যেও যেভাবে রাস্তাঘাট ঠিক রেখেছেন, তড়িঘড়ি মেরামত করেছেন, ধ্বস সরিয়েছেন তাতে অসাধারণ নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতাই প্রকাশ পেয়েছে। কার্শিয়াং রেল লাইনের ধারে কিছু এলাকা ছাড়া রাস্তার শোচনীয় অবস্থা কোথাও চোখে পড়ে নি।

দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার সবচেয়ে মধুর গম্ভীর সৌন্দর্য হল পাহাড়। কিন্তু তারই কোল ঘেঁষে বুক চিরে চড়াই-উৎরাই পথের শোভাও কম নয়। দু-চোখ ভরে পথের সৌন্দর্য দেখে দিবারাত্র পথ হাঁটা যায়। পাহাড় যেমন টানে, পাহাড়ী পথও তেমনিভাবে প্রকৃতি প্রেমিককে হাতছানি দেয়। এ পথ তদারকি করে সুন্দর না রাখলে চলবে কেন?

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের আগে পার্বত্য এলাকায় পথ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। পাহাড়ী বনের মধ্য দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো সরু পথ আর বেগবতী সরু নালার ওপরে ছোট ছোট কাঠের সেতু। যোগাযোগ বলতে এই। ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে লেফটেন্যান্ট জেনারেল লয়েড একটি অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করলেন। সেই প্রথম এই পার্বত্য এলাকায় আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হল। বর্তমানে যেখানে জলাপাহাড় ক্যান্টনমেন্ট, ক্যালকাটা রোড বিস্তৃত হল এই পর্যন্ত। শুরু হল যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিক সম্প্রসারণের কাজ।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল ১৮৩৯ সালে এবং পানুঘাবাড়ি থেকে কার্শিয়াং ডাও হিল ও সেনচল হয়ে ঘুম পর্যন্ত পুরনো মিলিটারি রোড শেষ হল ১৮৪২ সালে। কিন্তু গাড়ি চলাচলের পক্ষে এই রাস্তা অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় দার্জিলিং পর্যন্ত গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৮৬০ সালে। যানবাহনের জন্য কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং-এর আংশিক পথ খুলে দেওয়া হয় ১৮৬৪ সালে এবং পুরো রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয় ১৮৬৯ সালে।

১৮৭৮ সালে কলকাতার মের্সাস টম মিচেল অ্যান্ড রামসে কোম্পানির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল দার্জিলিং পর্যন্ত একটি 'ট্রামওয়ে' তৈরি করতে। তখন একে বলা হত 'বাষ্পীয় ট্রাম পথ'। ১৮৮০ সালে টুং পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হল, ১৮৮১ সালের জুলাই মাসে দার্জিলিং পর্যন্ত এই পথ তৈরি হল। তখন থেকে এর নতুন নামকরণ হল-দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে।

তিস্তা ভ্যালী রোড শেষ হল ১৮৫০ সালের অল্প পরে আর তিস্তা নদীর ওপরে মূল ঝুলন্ত

সেতু তৈরি হল ১৮৬৫ সালের অল্প পরে। এই ঝুলন্ত সেতুর পরিবর্তে পরবর্তীকালে তৈরি সিমেন্টের কনক্রিট সেতু। এই অ্যান্ডারসন সেতু ১৯৬৮ সালে তিস্তার ভয়াবহ বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। তিস্তা সেতুর সংগে কালিম্পঙের যোগাযোগের রাস্তা ঋষি রোড তৈরি হয় ১৯১৪ সালের অল্প পরেই।

বর্তমানে দার্জিলিং জেলার কয়েকটি দীর্ঘ পাহাড়ী পথ হলঃ মানেভঞ্জন-রিমরিক রোড(২২ কি.মি), দার্জিলিং-পুলবাজার-বিজনবাড়ি রোড (২৬ কি.মি), দার্জিলিং-সিংলাবাজার রোড(১৯ কি.মি সুখিয়াপোখরি-নাগরি রোড(১৪ কি.মি), তাক্‌দা-তিস্তা ভ্যালি রোড(১৬ কি.মি) মিরিক-সীমানা বস্তি রোড (২১.৫০ কি.মি) গারিধুরা বালাসন-মিরিক রোড(৩১ কি.মি) কালীঝোরা লাত্‌পানচোর(১২ কি.মি) কার্শিয়াং-বিনাচিনটন (১৪ কি.মি.) পিসোক-মংপু রোড (১৩.৪৩ কি.মি), মংপু-রামসিবাজার রোড(১১.৯ কি.মি) প্রভৃতি।

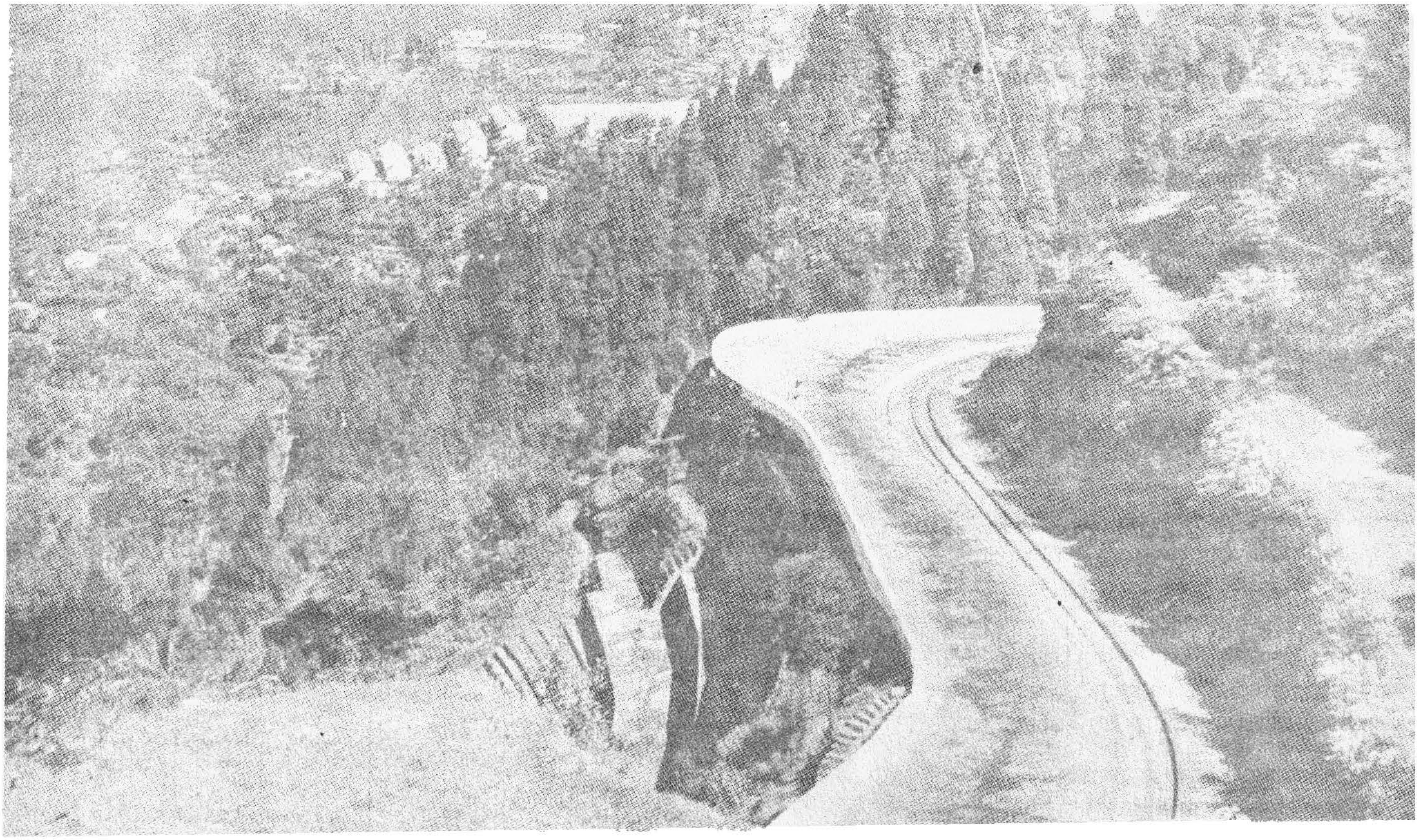
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের দার্জিলিং পার্বত্য বিষয়ক শাখা সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৮০-৮৪ সময়সীমার পরিকল্পনায় ২৮৫ কি.মি প্রধান রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ওপর। এই পরিমাণ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৬৭ কি.মি গ্রামীণ পথ ও বাকি ২১৮ কি.মি হল অন্যান্য জেলা সড়ক। সুখিয়াপোখরি মানেভঞ্জন রোডের ৭ কি.মি পথের উন্নতিবিধান করা হবে। এর ফলে রিমরিক, সানদাকফু ও ফালুট পথে যেতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হবে। মানেভঞ্জন থেকে ধোত্রে পর্যন্ত ২১ কি.মিটারের বেশি পথ চওড়া করা হবে। এর ফলে রমণ হাইডেল প্রজেক্টের পথে সমস্ত গ্রামগুলিতে যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই হাইডেল প্রজেক্টের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ পথটির ব্যয়ভার সমানভাবে রাজ্য পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় সহায়তা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ থেকে বহন করা হবে বলে স্থির হয়েছে।



পার্বত্য এলাকার একটি সেতু

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নানা দিক দিয়েই এই সড়কের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হবে। ১৯.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বিজনবাড়ি ঝোপ-লোধোমা রাস্তা দার্জিলিং থেকে রমণ হাইডেল প্রজেক্টে যাবার বিকল্প রাস্তাই শুধু নয়, এই প্রধান সড়ক দুপাশের অসংখ্য গ্রামের আর্থিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা নেবে। বিজনবাড়ি ও দার্জিলিং বাজারের উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে যাওয়া অনেক সহজতর হবে। এটি সপ্তম পরিকল্পনায় শেষ হবে। ১২.৫ কি. মি দীর্ঘ মংপু-রামডি বাজার রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে। তিস্তা উপত্যকা ছুঁয়ে শিলিগুড়ির সংগে মংপুর কুইনাইন কারখানা ও সিংকোনা বাগিচা এলাকা যুক্ত করে যে রাস্তা হচ্ছে, তা ছাড়াও দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির মধ্যে বিকল্প যোগাযোগের জন্য আর একটি সড়ক নির্মিত হবে। এই পরিকল্পনার সময়সীমায় উপরোক্ত প্রকল্পগুলি ছাড়াও আরও ৬১.৩৫ কি.মি রাস্তা নির্মিত হবে।

ধাজিয়া বস্তি এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ খারাপ এবং এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। তাদের উৎপন্ন ফসল যাতায়াত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে আর্থিক উন্নয়ন ঘটে। এর জন্য চাই উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই নাগরি ও ধাজিয়ার মধ্যে মূল্যবান সড়ক যোগাযোগের



শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং সংযোগ সড়কের পাশে ছোট রেলপথ

জন্য ৭.৪২ কি.মি রাস্তা নির্মিত হচ্ছে। এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে পুধিয়া হয়ে একে যুক্ত করা হবে মিরিক–গারিধুরা রাস্তার সঙ্গে। এর ফলে সুখিয়াপোখরি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি বিকল্প যোগাযোগ বেড়ে যাবে।

এইভাবে পার্বত্য বিষয়ক শাখা সচিবালয় সুখিয়াপোখরি–নাগরি রোড থেকে পোখরিয়াবোঙ্গ সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত মিরিকের জন্য একটি বাইপাস রোড, ২১ কি.মি দীর্ঘ ভারত–নেপাল সীমান্ত বরাবর রাস্তা, বাগোরার সঙ্গে আপার মাংরিং–এর সংযোগ ঘটাতে ৬ কি. মি রাস্তা প্রভৃতি অসংখ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দেহের শিরা–উপশিরার মতো পার্বত্য এলাকায়ও অসংখ্য রাস্তাঘাট তৈরির পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। এর ফলে পার্বত্য এলাকার আর্থিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। কিন্তু সীমিত আর্থিক ক্ষমতার জন্য অনেক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। তবু এই পরিকল্পনাকালে নতুন উদ্যমে অসংখ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।



বিজন বাড়ী দার্জিলিং রাস্তার কাজ চলছে

দার্জিলিং-এ বুড়ি বালসার সেতু নির্মিত হয়েছে।

১৯৮০–৮৫ পরিকল্পনার সময়সীমায় রাজ্য পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২৮২.৮০ লক্ষ টাকা ও বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণ ৩৬১.৪৮ লক্ষ টাকা।

দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার উন্নত যোগাযোগ–ব্যবস্থা পাহাড়ী এলাকার শোভাকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলবে। গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে সহরের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হবে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাড়া জাগবে। দূর–দূরান্তে পর্যটন আকর্ষণ যেমন বাড়বে, এলাকায় আর্থিক লেন–দেনও বেড়ে যাবে। আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি হল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। পার্বত্য এলাকার সেই সার্বিক উন্নয়নে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন শাখা সচিবালয়। আর তাদের পরিকল্পিত যোগাযোগ–ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে চলেছেন রাজ্যের পূর্ত (সড়ক) বিভাগ।

সংস্কৃতি সংবাদ

শান্তি সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মিছিল

'শান্তি, সম্প্রীতি ও জাতীয় অখন্ডতা রক্ষা করুন'-এই ফেস্টুন হাতে রাজ্যের সর্বস্তরের লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবিরা ৮ নভেম্বর ৮৪ তারিখের সূর্যোদয়ের পরেই পথে নামলেন, রাজ্যের জনগণ তথা সমগ্র ভারতবাসীর নিকট আবেদন-কোন অবস্থাতেই যেন জাতীয় অখন্ডতা বিনষ্ট না হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে।

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকার মিছিলে অংশ গ্রহণ করে সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে পথ পরিক্রমা করেন এবং মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক-লেখক-শিল্পী-সংঘের উদ্যোগে মিছিলটি দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বেরিয়ে রাসবিহারী এভিনিউ, সদানন্দ রোড, হাজরা রোড, হরিশ মুখার্জী রোড, এলগিন ল্যান্সডাউন হয়ে পদ্মপুকুরে গিয়ে শেষ হয়।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলা মাহেশ্বরী, শ্রী অনুপকুমার দাস, শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা অনবরত ঘোষণা করে চলেছেন জাতি ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। সর্বোপরি শোকপ্রকাশের নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে খুন জখম হামলা-লুঠতরাজকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়।

মিছিলে গুরুদ্বার জগৎসুধারের সামনে থেমে শিখ ভাইবোনদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে শিখ অধ্যুষিত অঞ্চল পরিক্রমা করে। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ দলে দলে মিছিলে যোগ দিয়েছেন, শিখ সংগীত শিল্পী অমৃক সিং অরোরা মিছিলে যোগ দিয়েছেন। অ-বাংলাভাষাভাষী শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীদের কেউ না কেউ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী মৃণাল সেন, শ্রী শিশির সেন, শ্রী আশু সেন, শ্রী শান্তিময় গুহ, শ্রী হীরেন ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী সুশীল মুখার্জি, প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, সাহিত্যিক শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া আরও গণতান্ত্রিক চিন্তায় চেতনায় বিশ্বাসী অনেক চলচ্চিত্র শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, এবং গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ ও জনবাদী লেখক সংঘ-এর প্রথম সারির কবি-সাহিত্যিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকগণ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন এবং সংঘের প্রায় সকল সদস্যই সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলনে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছেন।



শান্তি সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মিছিল,

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণতহবিল সংগ্রহকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত

বিরাট যাত্রানুষ্ঠান

১৬ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর '৮৪

স্থান রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ □ প্রতিদিন সন্ধ্যা৬-৩০ মি □ রবিবার ২ ও ৬-৩০ মি

১)	১৬ নভেম্বর	তরুণ অপেরা	টিপু সুলতানের তরবারি	শ্রেঃ শান্তিগোপাল, শিখা বোস
২)	১৭ নভেম্বর	বিশ্বরূপ যাত্রা সংস্থা	নরক জননী	শ্রেঃ পান্না চক্রবর্তী, মল্লিকা চ্যাটার্জী
৩)	১৮ নভেম্বর (দুপুর)	নব অম্বিকা নাট্য কোং	দেবী পার্বতী	শ্রেঃ শিবানী ভট্টাচার্য, রাজা ভট্টাচার্য
৪)	১৮ নভেম্বর (সন্ধ্যা)	জনতা অপেরা	এক পয়সার মা	শ্রেঃ বেলা সরকার, দেবগোপাল ব্যানার্জী
৫)	১৯ নভেম্বর	অগ্রগামী	নটী তারাসুন্দরী	নাট্য নির্দেশনা ও অভিনয়ে : বীণা দাশগুপ্তা
৬)	২০ নভেম্বর	যাত্রালোক	ভানুমতির খেলা	শ্রেঃ অনাদি চক্রবর্তী, শর্মিলা পাল, তপন গাঙ্গুলী
৭)	২১ নভেম্বর	মঞ্জরী অপেরা	শিল্পী	শ্রেঃ তপন ভট্টাচার্য, সীমা সরকার, কবিতা কর
৮)	২২ নভেম্বর	তপোবন নাট্য কোং	সূর্য্য পুত্র কর্ণ	শ্রেঃ দুলাল চট্টোপাধ্যায়, রাজা বোস, গীতাঞ্জলি ব্যানার্জী
৯)	২৩ নভেম্বর	লোকরঙ্গ	শার্দুল জারাক খান	শ্রেঃ শিবদাস মুখার্জী, সঞ্চয়িতা চ্যাটার্জী
১০)	২৪ নভেম্বর	মুক্ত অঙ্গন যাত্রা সমাজ	কালো সিন্দুর	শ্রেঃ নির্মল মুখার্জী, মীনাকুমারী
১১)	২৫ নভেম্বর (দুপুর)	নট জাগরণী যাত্রা ইউনিট	নরক থেকে বলছি	শ্রেঃ প্রশান্তকুমার, স্নিগ্ধা চৌধুরী
১২)	২৫ নভেম্বর (সন্ধ্যা)	সত্যনারায়ণ অপেরা	সম্রাট হিরণ্যকশিপু	শ্রেঃ রাখাল সিংহ, সুজাতা বোস, রাজকুমার
১৩)	২৬ নভেম্বর	নবরঞ্জন অপেরা	অগ্নিবাসরে প্রিয়া	শ্রেঃ তপনকুমার, মহুয়া চ্যাটার্জী, ঠাকুরদাস মিত্র
১৪)	২৭ নভেম্বর	শিল্পীতীর্থ	জয়া	শ্রেঃ কালিদাস গাঙ্গুলী,সঞ্চিতা মুখার্জী, কুমার ইন্দ্রনাথ
১৫)	২৮ নভেম্বর	চন্দ্রলোক অপেরা	শচীমাতাগো	শ্রেঃ জ্যোৎস্না দত্ত, গুরুদাস ধাড়া
১৬)	২৯ নভেম্বর	নাট্যতীর্থ	শের-ই-বাহাদুর শা	শ্রেঃ শেখর গাঙ্গুলী, শর্ম্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী, প্রভাত গৌতম
১৭)	৩০ নভেম্বর	লোকনাট্য	বিমাতা কৈকেয়ী	শ্রেঃ অশোককুমার, মীনাক্ষী দে, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮)	১ ডিসেম্বর	গন্ধর্ব অপেরা	শকুন্তলা	শ্রেঃ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,ছন্দা চ্যাটার্জী,
১৯)	২ ডিসেম্বর (দুপুর)	রাণার যাত্রা ইউনিট	কালবৈশাখী	শ্রেঃ অরুণ মুখার্জী, শ্যামলী ভট্টাচার্য, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী
২০)	২ ডিসেম্বর (সন্ধ্যা)	তারা মা অপেরা	নিষ্কৃতি	শ্রেঃ উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, কনকলতা, কাজল মুখার্জী
২১)	৩ ডিসেম্বর	গণবানী	মহাজনের মেয়ে	শ্রেঃ নিরঞ্জন ঘোষ, লতা দেশাই, মনিমালা বোস
২২)	৪ ডিসেম্বর	নিউ প্রভাস অপেরা	বিন্দুর ছেলে	শ্রেঃ বর্ণালী ব্যানার্জী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী, অনুপকুমার
২৩)	৫ ডিসেম্বর	ভারতী অপেরা	হীরা ঝিলের কান্না	শ্রেঃ ইন্দ্র লাহিড়ী, লীনা চক্রবর্তী, গৌতম সাধুখাঁ
২৪)	৬ ডিসেম্বর	মোহন অপেরা	দুর্গতিনাশিনী দুর্গা	শ্রেঃ দ্বিজু ভাওয়াল, মিতা চ্যাটার্জী ভোলা পাল

সিজিন টিকিট : ৭৫ টাকা
দৈনিক টিকিট : ৩ টাকা, ৫ টাকা, ৭ টাকা
টিকিট প্রাপ্তিস্থান

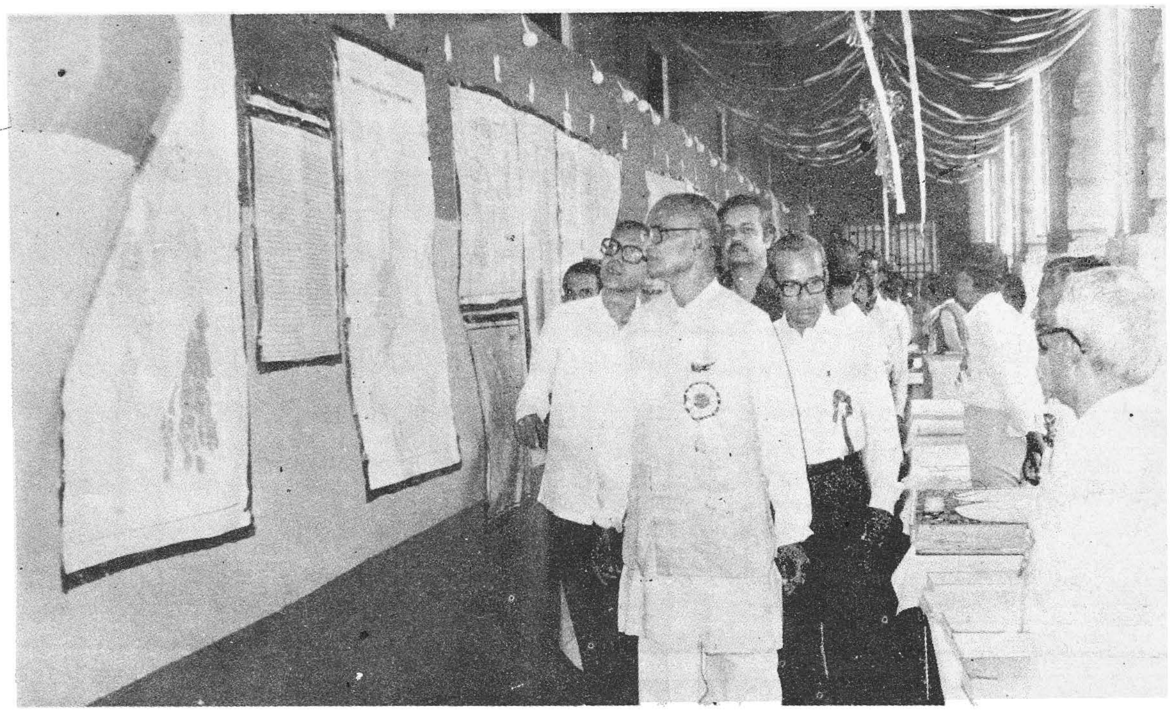
রবীন্দ্রসদন ● অহীন্দ্র মঞ্চ ★ বিজন থিয়েটার ● প্রিয়া সিনেমা

লোকরঞ্জন শাখা এণ্টালি জেম সিনেমার বিপরীতে



গত ২০ অক্টোবর কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলে পরিবার কল্যাণ শিবিরে ভাষণরত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু।

(কোচবিহার জেলা তথ্য দপ্তরের সৌজন্যে)



ফটোঃ শ্রী সুমন্ত পত্রনবীশ

ভূমিলেখ্য ও জরিপ অধিকারের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ প্রদর্শনী দেখছেন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী।



ফটোঃ শ্রীরতন দাশগুপ্ত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিবসে তাঁর মর্মরমূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০ ০১৯ হইতে মুদ্রিত।